চণক-সংহিতা

চণক-সংহিতা

কালিদাস রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : সুবোধ দাশগুপ্ত
অলঙ্করণ : সুধীর মৈত্র

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫১

মূল্য : ৩ টাকা ৫০ ন.প.

স্নেহাস্পদ কথাসাহিত্যিক

শ্রীমান্ রমাপদ চৌধুরীর

করকমলে—

॥ সূচী ॥

চণক সংহিতা

একটা নামজাদা ইস্কুলের গেটে দেখতে পাওয়া গেল, টিফিনের সময় ছেলেরা ছোলাভাজা, ছোলা ছেঁচকি, ছোলার ঘুগ্‌নি কিনে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে সুশ্রী দোহারা কিংবা নাদুসনুদুস তেহারা, চৌহারা চেহারার ছেলেই বেশি। চেহারা দেখে মনে হয়, তারা সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে। মনে হ'ল, তাদের মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজনে জড়তাপ্রাপ্ত রসনায় আছোলা ছোলা খুবই রোচনীয়। আপন আপন বাড়িতে তারা নিশ্চয়ই এই উপাদেয় সুখাদ্যটি পায় না।

মনে পড়ে নিজের বাল্যকালের কথা। মাঠে গিয়ে ছোলার গাছ থেকে অর্ধপুষ্ট ছোলার শুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতাম (খাদ্য খাদক দুইই কচি), ক্ষুধার তাড়নায় নয়, আমোদপিপাসার প্রেরণায়। আগুনে ঝলসে নিয়ে তার রোচকতা বাড়ানোও হ'ত। দোল, রথ, রাসের মেলায় মোণ্ডা মিঠাই না কিনে ছোলাভাজা, ছোলার নাড়ু, ছোলা ছেঁচকি কিনে খেতাম। দু-পয়সাব একটা রসগোল্লা মুখে ফেলে দিলেই ফুরিয়ে যায়। দুপয়সার ছোলার খাদ্যকে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে স্বাদানন্দ লাভ করা যেত। আজ ষাট বছর পরে স্মৃতিতে তারই 'চর্বিত-চর্বণ' ক'রেও আনন্দ পাচ্ছি।

অধ্যাপক ললিতকুমারের গাছছোলা নামে একটি রসরচনা আছে। বাংলা সাহিত্যে তাই একমাত্র চণকসাহিত্য। তাতে তিনি পল্লীজীবনে বাল্যকালে ঝলসানো কাঁচা ছোলায় যে স্বাদানন্দ লাভ করেছিলেন তারই কথা কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সোজা কথায় তাকে বলা যায়, চাণক্য (চণক + ষ্ণ্য) বাল্যস্মৃতির চর্বিত চর্বণ।

একজন সংভ্রান্ত ঘরের মহিলার মুখে শুনেছি তাঁর বাবার ঘোড়ার জন্য বালতিতে ছোলা ভিজানো থাকত—ঘুরতে ফিরতে তিনি তাই

মুঠোমুঠো মুখে তুলে চর্বণানন্দ লাভ করতেন বাল্যকালে। তাঁর গৌরোজ্জ্বল পীনাঙ্গ দেখে মনে হয় তার সুফল তিনি পেয়েছেন। তাঁর নাম অবশ্য তুরঙ্গিণী নয়, তরঙ্গিণী। এতে বাজিভক্ষ্যের বালভোজ্য প্রতি-শব্দটির সার্থকতা সূচিত হয় (ছোলা অর্থাৎ চণকের দুইটি প্রতিশব্দ বাজিভক্ষ্য ও বালভোজ্য—শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। গর্ভে থেকেই শিশু ছোলাভাজার স্বাদ পেতে চায়—তাই কি ছোলার প্রতিশব্দ হয়েছে বালভোজ্য? যাই হোক ছোলা যে নারীভোজ্য তা সকলেই জানেন। রাস্তায় যখন গাছছোলা ফেরি করে বিক্রী হয় তখন মহিলারাই তা কেনেন। তাঁরা নিজেরাই ছোলা খেতে ভালবাসেন এবং নানাভাবে ছোলাকে উপাদেয় খাদ্য ক'রে তুলতে জানেন ব'লে সেখাদ্য পুরুষদের সুখাদ্য হয়ে ওঠে।

যৌবনে যেসব শিক্ষিত লোকে প্রাতরাশে চায়ের সঙ্গে ডিম টোস্ট ইত্যাদি খেতেন বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের দেখেছি লবণাক্ত আদা ও ভিজে ছোলা খেতে, কেউ কেউ ছোলা ভিজের জলও খান। আয়ুর্বেদে তারও গুণ-পরিচয় আছে।

ছোলার খাদ্যকে দরিদ্রভোগ্য মনে ক'রে সংভ্রান্ত লোকেরা তা বাড়িতে কিনে আনানো অমর্যাদাজনক ভাবেন। ভৃত্যকে তা আনতে বলাও লজ্জাকর। কিন্তু হাতের কাছে পেলে সবাই খান। একজন পদস্থ প্রবীণ ব্যক্তি আমার কানে কানে বলেছিলেন—"দাঁত বাঁধিয়ে আমার মস্ত একটা সুবিধে হয়েছে ভাই, ছোট নাতিকে দিয়ে আনিয়ে দুজনে বহুদিন পর আবার খুব ছোলাভাজা খাচ্ছি, গোপনে অবশ্য।"

ছোলা আরো পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গে মিলে একটি দন্ত্য- (দন্তে পেষণ-সাপেক্ষ) তালব্য (palatable দিলীপকুমারের ভাষায়) মিশ্র খাদ্যের সৃষ্টি করেছে তার নাম চানাচুর। চানাচুর সকলেরই উপভোগ্য। বিশেষতঃ পানাতুর লোকের চানাচুর উৎকৃষ্ট অবদংশ (মদের চাট)।

বেদনা পেলে সবাই কাঁদে, ছোলা কিন্তু হাসে। ছোলাকে তপ্ত খোলায় ভাজলে তার মুখে উত্তাপের বেদনায় হাসি ফোটে।

রাশি-রাশি ছোলা হাসি-হাসি মুখে যখন পথের ধারে খোলার ঘরের গামলায় নৈবেদ্যের মতো বিরাজ করে, তখন তা দেখে সভ্যাসভ্য সকল পথিকেরই লালা সংবরণ ক'রে চলতে হয়। সকল পথিকের রসনাতেই পথের পাঁচালীর অপুর মতো লুব্ধ বা ক্ষুব্ধ লালসা জেগে ওঠে।

এটা হলো ভাজাছোলার আছোলা রূপ। আছোলা ছোলার সংস্কৃত নাম কঞ্চুকী। এ কঞ্চুকী 'অন্তঃপুরচর' হলেও দরবারে প্রবেশ করতে পায় না। ভাজা ছোলা কঞ্চুক বর্জন ক'রে অর্থাৎ ছাল-তোলা হয়ে লবণ মসলার পরিচ্ছদে সভ্য সেজে ডাল মুট (বুট?) রূপে চায়ের টেবিলে যখন নানা সুসভ্য খাদ্যের সমাজে স্থান পায় তখন কোন সজ্জন দন্তী অতিথি তাকে উপেক্ষা করতে পারে?

আর্যগণ সূর্যদেবের উদ্দেশে পায়সান্ন এবং চন্দ্রদেবের উদ্দেশে ঘৃতসিক্ত অন্ন নিবেদন করত। স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে কি নিবেদন করত?

নিশ্চয়ই চণকচূর্ণ অর্থাৎ ছোলার ছাতু এবং চণকসূপ অর্থাৎ ছোলার দাল। আজিও তাই ওঁদের ভারতীয় পশুবংশধরদের চণকই নিবেদন করতে হয়। স্বর্বৈদ্যের প্রসাদেই কি ছোলা প্রচুর ভিটামিন লাভ করেছে? আর যেসব গুণ লাভ করেছে একটি সমাসবদ্ধ পদে তা—কফবাতবিকার-শ্বাসোর্ধ্বকাস-ক্লমপীনসনাশিত্বম্—ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

অশ্বের অশনীয় বলে ছোলাকে হেলা করে কাপুরুষেরা। ছোলা বীরত্বধাত্রী বীরভোগ্যা। তারা জানে না শিবাজীর নেতৃত্বে মাওয়ালী বীরেরা বিনা জিনের ঘোড়ায় চড়ে যখন যুদ্ধে যেত—তখন তাদের পিছে পিছে রসদের গাড়ি ছুটত না। তারা চটের ছালায় আছোলা ছোলা ভরে নিয়ে যেত সঙ্গে। তাই বাহ্য-বাহন উভয়েরই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করত—দেহে বলাধান-ও করত। কত দিন শিবাজীর ভাগ্যেও এ ছাড়া অন্য ভোগ্য জোটেনি।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কারণ, ভাত কাকের প্রিয় খাদ্য। ছোলা ছড়ালে শুক, পারাবত, ময়ূরের অভাব হয় না। এতেও ছোলার কৌলীন্য সূচিত হয়।

শুধু জলের যোগেই ছোলা জলযোগের উপযোগী খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। অগ্নিযোগে তো কথাই নেই।

আফিসের দরজায় টিফিনের সময়ে দেখেছি শালপাতার ঠোঙায় দরিদ্র কেরানী যুবকেরা দুই চার পয়সার অঙ্কুরিত ছোলা লবণযোগে আহার করছে। তারা তো সকালে আলুসিদ্ধ ভাত নাকে মুখে গুঁজে এসেছে। তাদের ক্ষুধার মাত্রা যা, তা দুই চার পয়সায় আর কিছুতে নিবৃত্ত হ'তে পারে না। তাছাড়া, দুই চার পয়সায় এত ভিটামিন আর কিসে মিলবে? যাদের ছোট ভাইবোনেরা মুড়িও পাচ্ছে না—তারা ছোলা ভিজে ছাড়া কি আর-কিছু খেতে পারে?

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পথের ধারে জলসত্র বসে। তাতে পিপাসুকে জলের সঙ্গে একমুঠো ভিজে ছোলা ও গুড় দেওয়া হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলায় নগর সংকীর্তনের গায়কদের কণ্ঠে যখন হরিনাম শুকিয়ে বিরস হয়ে যায়—তখন ভক্ত গৃহস্থবাড়ির ছোলাগুড় আবার তাকে সজীব সরস করে দেয়।

দেখা গেল ছোলা বিবিধরূপে দেবমানব-পশুপক্ষিনির্বিশেষে আপামর সাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এ-তো ছোলার উপখাদ্য রূপের কথা। ছাতু বা শক্তুরূপে ছোলা মুখ্য (অর্থাৎ মুখরোচক ?) খাদ্যই হতে পারে। দেশের হতবুদ্ধি ব্যবসায়ীরা কেন যে চাউলের অভাবে বস্তা-বস্তা ছালা-ছালা ছোলা আমদানি করছেন না সস্তায়, তা বুঝতে পারি না।

ছোলাগুলি দিয়ে যে খাদ্যসমস্যার সোজাসুজি সমাধান হতে পারে, গোলাগুলি দিয়ে তা কি সম্ভব? আমরা লাখ লাখ 'বাঙালকে' (?) 'ঘটিচোর' বানিয়েছি, দুতিন কোটি ভাতুয়াকে আর ছাতুয়া বানাতে পারব না?

ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরাজি ভাষায় সর্বাঙ্গীণ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য সুরা পান করতে এবং নানাজীবের মাংস খেতে হয়েছিল, হিন্দী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে কী খেতে হবে তা কেন কেউ বাৎলে দিচ্ছেন না ?

অনেকের মুখে খাদ্যের নানারূপ অনুকল্প ব্যবহারের উপদেশ শুনি। কেউ কেউ বলেন—ভাত না পাও কেক-পাঁউরুটি খাও, আলু খাও, ফল খাও, ওল, কচু ইত্যাদি মূল খাও। চালের ক্ষুদও যদি না পাও গাইয়ের দুধ খাও—ঘোল খাও। কিন্তু কেউতো বলেন না—ছোলা খাও, চানা দিয়ে নানাবিধ খানা বানাও।

জাতীয় শাসনে শুধু রাষ্ট্রীয় ভাষণ এক হ'লেই তো সর্বভারতীয় জাতীয় সংহতি হবে না, বসন, ভূষণ, অশনও অভিন্ন হওয়ার দরকার।

হিন্দুস্থানী শ্রমিকেব তুলনায় বাঙালী শ্রমিকরা দুর্বলতর কেন ? নিশ্চয়ই খাদ্যেব বৈষম্যেব জন্য। সরকারী শ্রমদপ্তরের এ বিষয় বিবেচ্য। অঙ্কুবিত ছোলায় যে প্রচুব ভিটামিন আছে—এ তথ্য স্বাস্থ্যদপ্তবের প্রণিধানযোগ্য। ছোলার চাষে বেশি জলের প্রয়োজন নেই—এ কথা কৃষিদপ্তব ও সেচদপ্তবের চিন্তনীয়।

ছোলাকে মুখ্য খাদ্য কবে তোলাতে আমাদের সংসারের খাদ্যের খাতে ব্যয় ঢেব কমে যাবে। এত শত খানাজ তরকারিব দরকারই বা কি ? ছোলাই তো একাধারে অন্নব্যঞ্জন দুই-ই। ভাতের সঙ্গে তেল, মসলা, হাঁড়িকুঁড়ি, হাতাবেড়ী, বাসনকোসন, শিল-নোড়া ইত্যাদি কত কি এসে আমাদের 'বাঁশবনে ডোমকানা' করে রেখেছে। চালের দামের আড়াই গুণ হয়ে পড়ে ভাতের দাম।

অখণ্ডিত চণক শুধু অশ্বের খাদ্য নয়, দন্তীবও খাদ্য, কিন্তু গুণ্ডিত ও পিণ্ডিত ছোলা দন্তী, উপদন্তী, রুগ্নদন্ত, ভগ্নদন্ত, দন্তহীন সকলেরই উপযোগী ভক্ষ্য—এ কথা ভুললে চলবে না।

কেউ কেউ বলবেন, একবেলা না হয় চণকচূর্ণই ভক্ষণ করা গেল—

অন্য বেলা? কেন? পাঁউরুটি আর খণ্ডিত ছোলার দাল। তুইই দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। রান্নাঘরের কান্নাকাটি (ধোঁয়ার ছলনায়) ঝগড়াঝাটি তো বন্ধ হবে!

ধনীরা যা হয় করুন, তাঁরা দেশের চাউল সবই কিনে মজুদ করুন। কিন্তু তাঁরাও ছোলাকে হেলা করতে পারবেন না। তবে ব্যক্তিই হোক, আর বস্তুই হোক তাকে অধিগম্য করতে হ'লে পেষণের দরকার। তাই ছোলা থেকে পেষণের বলে যে বেশন তৈরি হয়, তাঁদের ভোগ্য এবং যোগ্য যত ভোজ্য সেই বেশনেরই রূপান্তর। খাবারের দোকানের দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে যিনি চেয়ে দেখবেন—তিনিই দেখতে পাবেন বাজিভোজ্য ছোলা পিষ্ট হয়ে, কাজেই শিষ্ট হয়ে, মিষ্ট হয়ে কিভাবে রাজসিক ও রাজভোগ্য রূপ ধারণ করছে।

তাছাড়া, রুই মাছের মুড়ো দিয়ে রান্না ছোলার দাল তো ধনীদেরই ভোগ্য। নিরামিষ ছোলার দাল আমরাও খাই, কিন্তু প্রচুর কয়লা কিনবার পয়সার অভাবে আমরা রোজ খেতে পাই না। দুর্গাপুর থেকে সস্তায় যদি গ্যাস আসে তবে প্রত্যহই খাব বৈকি।

আমরা যে লাউ, পেঁপে, কুমড়ো, কাঁকুড় ইত্যাদি পান্‌সে তরকারিগুলো খাই সেগুলোতে ভিজে ছোলা যোগ দিয়ে স্বাদু করে তুলি। আর ব্যঞ্জনের অভাব হলে নুন লঙ্কা দিয়ে এক ডাবছোলার পিণ্ডিত ছাতুকেই ব্যঞ্জন বানিয়ে নিই, স্বরকে ব্যঞ্জন বানানোর মতো (দৃষ্টান্ত অ্যা)।

ব্যঞ্জন আমাদের অন্নকে স্বাদু করে, ছোলা সেই ব্যঞ্জনকে স্বাদুতর করে। আর ভাজা ছোলা-ভাজা আমাদের শুক্‌নো নীরস মুড়িকেও উপাদেয় ক'রে তোলে। ছোলার দাল নাহলে রুটি রোচনীয় হয় না, লুচিও রুচিকর হয় না। লুচি তো আর ঘিয়ে ভাজা হয় না।

যে গুহ্য কথাটি এতক্ষণ উহ্য রেখেছি, আগে ইঙ্গিত করেছি মাত্র

এইবার সেটি বলি, বাংলাদেশের গর্ভধারিণীরা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ছোলাভাজা খেতে খুব ভালবাসেন। সাত মাসে 'ভাজা' বলে একটা অনুষ্ঠানই আছে। তাতে ছোলাভাজা অন্যান্য 'ভাজা'-দেরও ডেকে

গর্ভধারিণী মায়েরা ছোলা খেতে ভালবাসে

আনে। অতএব জন্মের আগে থেকে ছোলার সঙ্গে বাঙালীদের নিবিড় সহজাত সম্বন্ধ। সুতরাং মুখ্য খাদ্য হিসাবে ছোলার প্রবর্তনের প্রস্তাব বাতুলের প্রলাপোক্তি নয়।

বইয়ের আদর

আহরণের দিক থেকে পুস্তককে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে—(১) স্বকীয় অর্থে ক্রীত, (২) উপহৃত, (৩) অপহৃত ; এ ছাড়া, ভিক্ষাহৃত ও বলাহৃত আরও দুটি উপশ্রেণী আছে। অনুনয়ে বা দীনতা প্রকাশে লেখক কিংবা প্রকাশকের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়াই ভিক্ষাহৃতি। ভিক্ষাহরণ সাধারণত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেই দেখা যায়। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা বা অনুরক্তজনের আবেদনের দ্বারা যে আহরণ তাও ভিক্ষাহরণের শ্রেণীভুক্ত। আর জোর করে দাতার অনিচ্ছায় যে আহরণ তা হল বলাহরণ। অপহৃতি যদি চুরি হয়, বলাহৃতি তবে ডাকাতি। বলাহৃতি অপহৃতি না হলেও অপাহৃতি (অপ + আ + হৃতি)।

স্বকীয় অর্থে ক্রীত পুস্তক নিজের এবং প্রিয়জনগণের পাঠের জন্য রক্ষিত হতে পারে। বন্ধুজন বা আত্মীয়জনের বিবাহ, জন্মতিথি ইত্যাদি—উপলক্ষে সে পুস্তক উপহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে ক্রেতা 'চন্দনভারবাহী জীববিশেষ' মাত্র। যে-সকল বইয়ের একবার পড়া হয়ে গেলেই আর প্রয়োজন থাকে না, সে-সকল বই আর সযত্নে সংরক্ষিত হয় না। যে-সব বইয়ের প্রয়োজন চিরন্তন, সেই বইগুলিই সযত্নে রক্ষিত হয়।

কারও টেবিল বা আলমারি থেকে গোপনে বই সরানোই আসল অপহৃতি। অপহরণ করে বিক্রি করবার উদ্দেশ্য থাকলে, সে-বই অপহর্তা অত্যন্ত সাদরে সযত্নে ও গোপনেই রক্ষা করে। সে-উদ্দেশ্য না থাকলেও অপহৃত বই অপহর্তার গৃহে সযত্নে এবং কতকটা গোপনেই থাকে।

লাইব্রেরি বা পাঠাগার থেকে ধার-করা বই টাকা জমা দিয়ে নাম

সই করে আনা হয়, কাজেই সেই ছাপ-দেওয়া-বই গাপ করা যায় না। সে-সব বই-এর কোন যত্ন নেওয়াও হয় না। সে-সব বই অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ফেরত যায়। অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের বহু পাতায় পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মন্তব্যও লিখে থাকেন। বইয়ের উপরে রবার-স্ট্যাম্পে ছাপ দিতে হয়—"অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকের পাতার কোণ মুড়িবেন না।"

কলেজের অধ্যাপকদের কাছে শুনেছি—কলেজ-লাইব্রেরির কোন কোন মূল্যবান পুস্তকের অনেক ফর্মা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করে কোন-না-কোন পাঠক কতকগুলি পাতা ছিঁড়ে নিয়েছে। এ হ'ল আংশিক অপহরণ। গ্রন্থানুরক্ত একাধিক জ্ঞানান্বেষী পাঠক যদি আপন আপন প্রয়োজনমত অংশগুলি ছিঁড়ে নেন—তা হলে শুধু ভূমিকা, সূচীপত্র ও পরিশিষ্টসহ অবশিষ্ট মলাটটাই লাইব্রেরিতে থেকে যেতে পারে। তখন একখানা অর্থনীতির পুস্তকের শূন্য মলাটের ভিতর ডস্টয়ভস্কির একখানা মলাটহারা নভেল অনায়াসে প্রবেশ করে দু'খানা বইয়ের হিসাব বজায় রাখতে পারে।

নিজের বই নিজেই অপহরণ করা যেতে পারে। যদি কোন ছাত্র নিজের নতুন-কেনা বইখানি পুরাতন বইয়ের দোকানে বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থে সিনেমা দেখে এবং বাড়িতে বাপ-মার কাছে বলে ইস্কুলে বা কলেজে বইখানা চুরি গিয়েছে, তা হলে সেটা হ'ল স্বাপহৃতি।

সবচেয়ে বেশী বই খোয়া যায় পড়বার জন্য অপরকে বই ধার দেওয়ায়। প্রায়ই দেখা যায়, পরিচিত ব্যক্তিরা বা বন্ধুবান্ধবেরা বই পড়তে নেন, কিন্তু যথাসময়ে তা ফেরত দিতে তাঁদের মনে থাকে না।—না-চাইতে খুব কম লোকই বই ফেরত দেন। তবে যাঁর বই তাঁরও তো স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ—বহুদিন অতীত হলে তাঁরও মনে থাকে না—কে বইখানি পড়তে নিয়ে গিয়েছে। সবাই যে ইচ্ছা করে ফেরত দেন না তা না হতে পারে। কারও কারও বইখানাকে এতই

দরকারী মনে হয় যে তিনি তা আর ফেরত দিতে চান না। ছাতা, ঘড়ি, দা, কুড়ুল, থার্মোমিটার, হটব্যাগ, টাইমটেবল, পাঁজি ইত্যাদির মত পড়ার বই এমন এসেনস্যাল বস্তু নয়, ধার নেওয়া টাকাও নয় যে, ফেরত দিতেই হবে—অনেকের এইরূপই ধারণা; ফেরত দেবার ইচ্ছা না থাকলে ধার-করা বইকে অত্যন্ত সযত্নে সংগোপনেই রাখতে হয়। কাচের আলমারিতে রাখা চলে না। অন্য কাউকে ধার দেওয়াও চলে না। অনেকেরই এ অভ্যাস আছে কাজেই এইভাবে গ্রন্থ আহরণকে অপহৃতি বললে তাঁরা রাগ করবেন—সেজন্য একে অপহৃতি না বলে অপাহৃতি বলব, অর্থাৎ হরণ না বলে আহরণ বলব। তবে অপ উপসর্গটি অপরিহার্য।

আমার 'বিদ্যাপতির পদাবলী' দুবার অপাহৃত হয়—তৃতীয় বার যখন বইখানা খুঁজে পেলাম না—কে নিয়ে গিয়েছে মনেও পড়ল না, তখন পাঠাসক্ত সুপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম "ওহে বিদ্যাপতিখানা ফেরত দিচ্ছ না কেন? তিন বছর হয়ে গেল—এখনও তোমার কাজ শেষ হল না?" এইরূপ প্রশ্ন করতে করতে বইখানার হদিস মিলে গেল। একজন বললে, "হাঁ স্যার, অনেক দিন হল। দোষ হয়েছে। কাল নিশ্চয় দিয়ে আসব।" বলা বাহুল্য, বইখানা দিয়েই গেল। তখন অন্যান্য যে সকল সুপরিচিতদের ঐরূপ অনুযোগ করেছিলাম—তাঁদের কাছে সবিনয়ে ক্রটি স্বীকার করলাম। এইরূপ প্রশ্ন করায় আর-একখানা বইয়েরও হদিস পাওয়া গেল। একজন বলেছিল, 'বিদ্যাপতি তো আমি নিইনি স্যার, তবে আপনার ভক্তিরত্নাকরখানা আমার কাছে আছে—তিন বছর নয়, মাত্র এক বছর। সাত দিনের মধ্যে দিয়ে আসব।" একেবারেই এ বইয়ের কথা মনে ছিল না। বললাম, "ভুল হয়েছে—হাঁ হাঁ 'ভক্তিরত্নাকর'। কী যে তোমাদের কাণ্ড!" না চাইলে ও বেশী তাগিদ না দিলে ফেরত দেব না এইরূপ সংকল্পই অধিকাংশের। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, "হারিয়ে ফেলেছি স্যার, একখানা কিনেই দেব। দামটা কত

বলুন ত।" তখন বলতে হয়, "থাক্, আর কিনে দিতে হবে না। বই পড়তে নিলে বই সম্বন্ধে সাবধান হতে হয় মনে রেখ।" অপহৃত ও অপাহৃত বইয়ের আদর সবচেয়ে বেশী।

বিদ্যাপতি তো অ'' · নিইনি স্যার

এইবার উপহৃত বইয়ের কথা বলি। বিবাহ উপলক্ষে তরুণ-তরুণীরা এবং জন্মতিথি উপলক্ষে ক্ষণজন্মারা নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে রাশি রাশি বই উপহার পান। বলা বাহুল্য, বইগুলি মূল্যবান

উপহারের অনুকল্পমাত্র 'মধ্বভাবে গুড়'। অতএব অনুকল্পের যতটা আদর এগুলিরও আদর ততটাই। এ সব বই বিয়েবাড়ির হট্টগোলে সাধারণত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে লুট হয়ে যায়। মূল্যবান শৌখিন বস্তুগুলি ফেলে বইয়ের দিকে তাকাবার অবসর থাকে না বাড়ির লোকদের। এইরূপ্ উপহৃত বইগুলির.তুই একখানা ক্বচিৎ কোথাও সযত্নে রক্ষিত হয়।

আমাব নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়িতে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিজে অপ্রবীণ। গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে কতকগুলি বই স্তূপায়মান —কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন বইয়ের দোকানের একজন মালিক বইগুলির স্বাস্থ্য, মূল্যবত্তা ও শ্রীসৌষ্ঠব পরীক্ষা করছে। গৃহকর্তা আবও বইয়েব সন্ধানে তেতলায় গিয়েছেন। ওই বইয়ের স্তূপে নৈবেদ্যের উপর মোণ্ডার মত আমার বচিত উপহৃত তিনখানি বই বিবাজ করছে। এই দেখে আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করলাম— শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে অপ্রতিভ তো করা যায় না। আমাবই উপহৃত আমার নিজের বই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে তু-আনা দশ পয়সায় অনেকবার কিনে এনে নিজের মান রেখেছি। এ পথ দিয়ে আমাব বহু পরিচিত লোক চলাফেরা করে, কাজেই উপায় কী?

সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে তিনবার একই বই দিয়েছি—তিনি তবু বলেন, "তোমার সেই হাসির গানের বইখানা দিলে না ত! তোমার বই কি কিনতে হবে নাকি?" তর্ক করিনি, চতুর্থবার আর-একখানি বইয়ের অপচয় করেছি।

বন্ধু বাড়িতে এসেছেন—বই উপহার দিয়েছি—নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছেন। তবু ভাল, আমার বই আমার কাছেই থাকল। নয়ত তিনি ট্রামে বাসে ফেলে যেতেন। মোটর চড়ে এলেই কি উপহৃত বই তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত? একজন মোটর-ড্রাইভার একবার আমাকে বলেছিল, "আপনার পদ্য ও ছড়াগুলো বেশ মিষ্টি স্যার্—

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব মুখস্থ করেছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমার কোনও বই কিনেছ নাকি?” সে বলল, “না স্যার্। সেদিন মেজবাবুর হাতে একখানা বই দিলেন আপনি। বাড়ি পৌঁছে মোটর থেকে নেমে তিনি উপরে উঠছিলেন—আমি বইখানা দিতে গেলাম ছুটে, সিঁড়ি থেকে তিনি বললেন, ওখানা তুমিই নাও। আমার বেশ লাভ হল।” দেখলাম অপহৃত না হলেও সে বইখানা একজনের কাছে বেশ সমাদর লাভ করেছে। মেজবাবুর দোতলায় উঠলে তার পাতা কেউ খুলত না। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথেই চলে যেত।

একজন পদস্থ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—রসচক্রের প্রকাশিত ১৮ খানা কথাসাহিত্যের বই উপহার সঙ্গে নিয়ে। বলা বাহুল্য, কিছু স্বার্থসিদ্ধিই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন, কিন্তু বললেন, “বাংলা বই আমি ত পড়ি না, রেখে যান, থাক্ মেয়েরা পড়বে।” একখানা বইও হাতে করে ছুঁলেন না। বাড়ি ফিরে ভাইয়ের কাছে তিরস্কৃত হলাম। আর এক বন্ধুকে একখানা বই উপহার দিলাম বাড়িতে এলে। চলে গেলে দেখলাম বইখানা পড়ে রয়েছে। পরদিন দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম “বইখানা না নিয়েই চলে এলে কেন?” সে বললে “আমি আনন্দবাজার জড়িয়ে তোমার সাক্ষাতেই ত নিয়ে এলাম। এখনও অবশ্য তা মোড়ক খুলে পড়বার অবসর পাইনি।” আমি বললাম, “বাড়ি গিয়ে দেখবে, সে বইখানা বিভূতির ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’। আমার বই তোমার নামে উপহার লেখা এ বাড়িতেই রয়েছে—‘দৃষ্টিপ্রদীপ’টাই খুঁজে পেলাম না।” যাই হোক, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’টাও ফেরত পাইনি—উপহৃত বইও সে নিতে আসেনি।

রা—বাবু ছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধু শ-কে খুব ভালবাসতেন। তখন আমাদের বয়স বাইশ-তেইশ। তাঁর সিমলা স্ট্রীটের বাসায় দেখা করতে গেলে

তিনি আমাকে তাঁর সাতখানা বড় বড় বই উপহার দিয়েছিলেন। আমি শ-এর কাছে সগর্বে সে কথা বললাম। তাতে শ— বলল, "আমাকেও দিয়েছিলেন সাতখানা বই। বোঝা বইতে হবে বলে আনিনি।" ভাবলাম শ— মিথ্যা জাঁক করছে। রা-বাবুকে শ-এর কথা বললাম। রা-বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমি শ-এর জন্য চা-জল-খাবারের ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভিতর গেলাম—ফিরে এসে দেখি শ— পালিয়েছে,—বইগুলোর মধ্যে কেবল একখানা নেই। ও বুঝি ইতিহাসের বই পছন্দ করে না?"

উপহৃত বইয়ের দুর্দশা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি নিজে রাশি রাশি পুস্তক উপহার পাই না। জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাংলা পুস্তকগুলি হয় কিনেছি, নয়ত ভিক্ষা করে পেয়েছি। অবশ্য কথাসাহিত্যের অনেকগুলি বই উপহার পেয়েছি, অধিকাংশই অনুজ সাহিত্যিকদের কাছে ধমকে চেয়ে নেওয়া—অনেকটা বলাহৃত; ইচ্ছা করে শ্রদ্ধাবশত উপহারও ক্বচিৎ কেউ কেউ দিয়েছে বৈকি। রাশি রাশি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য কবিতার বই উপহার পাই। তাই আমারও উপহৃত পুস্তকের প্রতি দরদ নেই। উপহৃত অধিকাংশ উপন্যাসও বাড়িতে নেই। ছেলেদের মাসিমারা বেড়াতে এসে সব নিয়ে যায়, পনেরো দিনের মধ্যে সে সব বই টালিগঞ্জ থেকে টালায় পরে বালিগঞ্জ থেকে বালিতে চলে যায়। উপন্যাসগুলোর পাখা আছে। ওগুলো কিছুতেই পোষও মানে না। যে পোষ মানে না, স্বতই তার প্রতি দরদ থাকে না। তা ছাড়া, একবার পড়লেই তার কাজ ফুরায়।

পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত লোকদের পরিতোষণের জন্য আমরা বই উপহার দিই। সেগুলিকে তাঁদের গৃহে রাখবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখতে পাই না। অধ্যাপকরা তাঁদের অধ্যাপনার সহায়ক গ্রন্থগুলিকে, ব্যবহারাজীবেরা আইনের বইগুলিকে যত্ন করে রক্ষা করেন। অনেক পদস্থ লোকের বাড়িতে পোশাকের জন্য ও খেলনার জন্য স্বতন্ত্র

আলমারি দেখি, কিন্তু সাহিত্য-পুস্তক রাখার জন্য স্বতন্ত্র আলমারি দেখি না। যাঁদের বই উপহার পাওয়ার আগ্রহ নেই—বই উপহার দিয়ে তাঁদের তুষ্ট করা যায় না। অধিকাংশ উপহৃত বই সরাসরি না-হোক একাধিক হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পুরাতন বইয়ের দোকানে চলে যায়। যাঁরা পুরাতন বই কেনেন, তাঁরা পুরাতন বইয়ের পাতা উল্টিয়েই দেখতে পাবেন—কে কাকে বইখানা উপহার দিয়েছেন। সেয়ানা লেখকরা বইয়ের এমন পাতায় উপহার লেখেন যে, পাতাটা ছিঁড়ে নতুন বই বলে তা দোকানে বিক্রি করা চলবে না।

যাঁর নামে কোন বই উৎসর্গ করা হয়—উৎসর্গ-করা বই একখানা অন্ততঃ তিনি সযত্নে রক্ষা করবেন—এ প্রত্যাশা করা যায়। কেউ কি তা করেন? অনেকে অল্প দিনের মধ্যে উৎসর্গের কথা ভুলে যান। একখানা পোস্ট কার্ড লিখেও অনেকে একটা ধন্যবাদও দেন না। উৎসর্গের দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তি ও উৎসর্গকারী লেখকদের মধ্যে এদেশে একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠে না। এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

যাক, এ সব অবান্তর কথা। যা বলছিলাম তাই বলি—অপহরণের ভয়ে জ্ঞানগর্ভ, চিরন্তন মূল্যের বইগুলো ও রেফারেন্সের বইগুলো তালা বন্ধ করে রাখতে হয়। জানি না তারা বন্দী হয়ে স্বাধীনতা ও অধিকতর সমাদর লাভের জন্য ব্যাকুল কি না! অধিকতর সমাদর যারা করবে তাদের চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যই এইরূপ বন্দী রাখার ব্যবস্থা। আমার নিজের নামে উৎসর্গ-করা বইগুলোকেও আমি আলমারিতে তালাবন্দী করে রেখেছি—এগুলি আমার পরম সম্পদ। যখনই সেগুলি আমার চোখে পড়ে তখনই তাদের লেখকের উদ্দেশে আমার হৃদয়ে প্রীতি বিগলিত হয়। যখনই ওই সব উৎসর্গের কথা মনে পড়ে, তখনই তাদের রচনার সংপর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করি।

কৃতী ছাত্র

সন্ধ্যার আগে বাইরের ঘরে বসে প্রুফ দেখছি—এমন সময় একজন সুবেশ সুকেশ সুশ্রী দীর্ঘকায় যুবক (বলা বাহুল্য কোট-প্যান্টপরা) ঘরে ঢুকল—পদস্থ ব্যক্তি মনে করে তাড়াতাড়ি উঠে নমস্কার করে বললাম—"আসুন, আসুন, বসুন।"

যুবকটি বলল—আমাকে আসুন, আসুন বলবেন না স্যার, আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আমার নাম তারাপদ। আপনাকে প্রণাম জানাতে এসেছি।

আমি—(না চিনেই) ও তাই নাকি বসো বসো। ভাল আছ ?

তারাপদ—দেখে কি মনে হয় ? যাক, আমাকে তো স্যার আপনার ভুলবার কথা নয়। আমি সুবোধ ছেলে ছিলাম না। আপনাকে অনেক জ্বালিয়েছি।

আমি—না, না, বাবা, সে কি কথা ? আমার তো কিছু মনে নেই। তুমি এই ভিড়ের সময় কষ্ট করে কি ট্রামেই এলে নাকি ? মোটার তো দেখছি না।

তারাপদ—ট্রামে ? ট্রামে আমি জীবনে চড়িনি। ইস্কুলে যখন আসতাম তখনও ঘরের মোটরেই আসতাম। একদিন আপনাকে মোটরে করে একটা আঁধা গলির ভিতর আপনার ভাড়াটে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম, আপনার কিছু মনে থাকে না। মোটর আমাদের একখানা নয় স্যার, তিনখানা। আরো একখানা কিনবার কথা হচ্ছে। আমার নিজেরই একখানা। তিনচারটা বাড়ি আগে মোটরটা দাঁড় করিয়ে এসেছি বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে। আমাকে আপনার ঠিক মনে পড়ছে না। আশ্চর্য ! বোধ হয় ভীমরতি ধরেছে।

আমি—ভ্রমার্তি ঠিক নয়। বুড়ো হয়েছি—এখন কি মনে থাকা

সম্ভব? এই দক্ষিণ কলকাতারই আমার তিন-চার হাজার ছাত্র পাস করে বেরিয়ে গেছে। যাক, এখন কি করা হয়?

তারাপদ—আমি এখন একটা বিদেশী ফার্মের ম্যানেজার। আপনি তো বলতেন—তোর কিচ্ছু হবে না, পাস করতেই পারবি না। আমি এখন দেশে ও বিদেশে একাধিক পাস করেছি। তবে আপনার একটা কথা ফলেছে, আপনি আমাকে তারাপদ না বলে টরপেডো বলে ডাকতেন—তা আপনার আশীর্বাদে আমি সত্যই টরপেডো হয়েছি।

আমি—কেন তোমার ফার্মের অবস্থা খুব খারাপ নাকি? ডুবুডুবু?

তারাপদ—না, না, ফার্মের অবস্থা খুব ভাল। (ভুল বুঝেছেন ভীমরতিতে) আমি টরপেডোর মতো প্রবল-শক্তি পেয়েছি, অথচ আপনি বলতেন আমার পরকাল ঝরঝরে। যে লক্ষ্যে ছুটি—সেই লক্ষ্যই ভেদ করি।

আমি—না, না, সে কি কথা। শাসনের জন্য ও-রকম দু-একটা কথা আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায় হয়ত। স্কুলে তো সুপ্ত শক্তির অস্তিত্ব ধরা যায় না—ভবিষ্যতে কে কিরূপ টার্ন নেবে তা বোঝা যায় না। অনেক ছেলে পরে গিয়ে ভালো হয়—নিজের ঠিক মনোমত লাইনটা পেয়ে গেলে, অনেক গাছ যেমন দেরিতে ফলে। ও-রূপ কথা বলে থাকলে বড় অন্যায় কাজ করেছি। ওসব কতকটা পরিহাস-বিজল্পিত, 'পরমার্থেন' ওসব কথা নিতে নেই। তোমার মধ্যে 'স্ফুলিঙ্গাবস্থায় এধাপেক্ষ'—হয়ে কী বহ্নি ছিল তা তখন জানব কি করে?

তারাপদ—যে ভাষাটাকে আমি বাঘের মতো ভয় করতাম—সে ভাষার বুলি এখনো ছাড়েননি দেখছি।

আমি—তোমার কথা এখন একটু একটু মনে পড়ছে—তুমি কি বিমল, রমেন, সুধীন, সুধীরদের সঙ্গে পড়তে?

তারাপদ—হাঁ, ওরাই আমার সঙ্গে পড়ত। আপনার স্নেহের পাত্র শ্রীমান বিমল তো এখন মাস্টারি করছে।

আমি—না, সে তো প্রোফেসারি করে, ডি-ফিল হয়েছে।
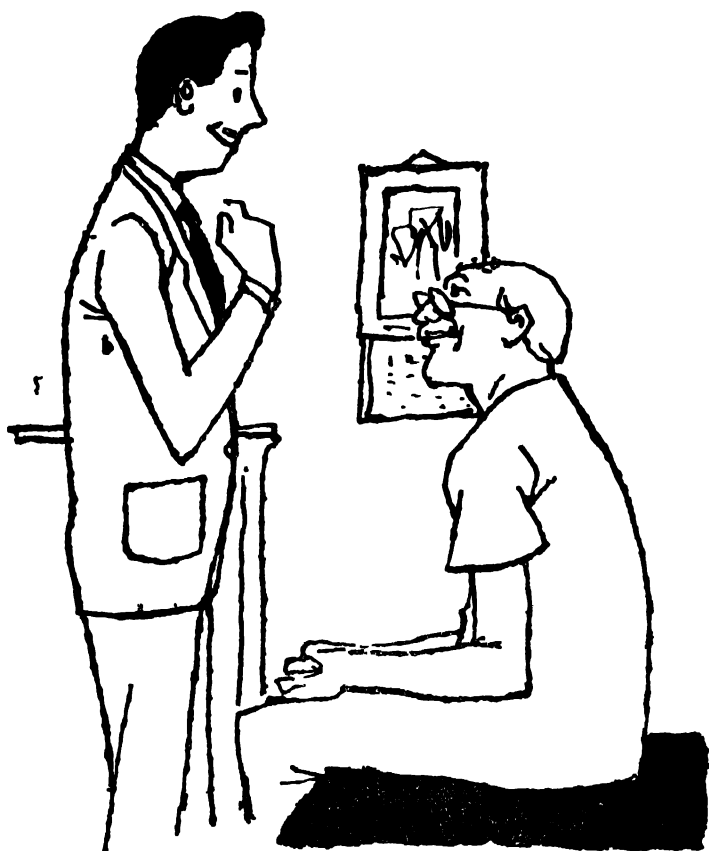
আমি সত্যই টরপেডো হয়েছি

তারাপদ—হাঁ, ঐ হলো। একটা বে-সরকারী কলেজে মাস্টারি করছে। আপনার প্রিয় ছাত্র সুধীর তো আলিপুরের আদালতের গাছতলায় ভেরেণ্ডা ভাজছে। আর বৃত্তি-পাওয়া সুধীন খবরের কাগজের আফিসে কলম পিষছে।

আমি—সে তো শুনেছি, স্টার পত্রিকার এসিস্টেন্ট এডিটার—সাত-আট-শো টাকা মাইনে পায়।

তারাপদ—ওই খবরের কাগজে কলমপেষার কাজ করাই তো হলো—একালে সাত-আট-শো টাকার কীই বা দাম বলুন? সাত-আট-শো টাকা তো আমাদের বাড়ির চাকরবাকর, জমাদার, প্রাইভেট-টিউটার, বাবুর্চি, ঠাকুর, ড্রাইভারের মাইনে দিতে হয়।

আমি—আর রমেন তো বিলাত থেকে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে বেশ বড় ডাক্তার হয়েছে, খুব প্র্যাক্‌টিস্।

তারাপদ—আমার মতন বাপের পয়সায় বিলাত যায়নি, শ্বশুরের পয়সায় বিলাত গিয়ে সেখানে চাকরি করে নামের সঙ্গে কতকগুলো বাজে হরফ জুড়ে নিয়ে এসেছে বটে—

আর কতকগুলো পাশ করে নরেশ তো মুন্সেফ হয়েছে। ভারি চাকরি!

আমি—বলো 'মুনসেফ হোক, মাইনে পাবে না।' তোমার মাইনে কত?

তারাপদ—মাইনে জিজ্ঞাসা করা সভ্যতা নয়। যাই হোক, ওদের সবার চেয়ে আয় ঢের বেশি; এইটুকু জেনে রাখুন। মুন্সেফের চাকরি তো ফুটবলের মত মাঠময় ঘুরে বেড়ানো।

আমি—তুমি তো মিঃ এস চ্যাটার্জির ছেলে, তাই নয়?

তারাপদ—ছেলে তো বটেই, 'অনলি সান।' এই তো মনে পড়েছে! আমাকে বাড়িতে পড়ানোর জন্য বাবা আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, ইস্কুলে যা পেতেন তার চেয়ে বেশিই তিনি দিতে চেয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন—কারো বাড়ি গিয়ে এখন আর পড়াতে পারব না—অথচ আপনি একটা ভাড়াটে ছোট্ট বাড়িতে তখন থাকতেন। বাবা গাড়ি পাঠিয়ে সপ্তাহে তিন দিন আপনাকে পড়াবার জন্য নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন—তাতেও আপনি রাজী হলেন না। বাবা তখন বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে—ভীমাপ্রসাদের

বাড়িতে ডাক পড়লে কি করেন? বাবা তখন গজেন বাবুকে রাখলেন—কিছুই ক্ষতি হলো না। পাস হয়ে গেলাম ড্যাং ড্যাং করে জুতিয়ে। আপনি তো ক্লাসে কিছুতেই পসিবল্ কোয়েস্চনের লিস্ট দিতেন না। তিনি এমন লিস্ট করে দিলেন, তার শতকরা আশিটা প্রশ্ন পরীক্ষায় পেয়ে গেলাম; আপনি পড়াতে রাজী হলে আমার মুশকিল হতো—আপনার তো দুটো কথা,—'খুব লেখ—আর শেখ। প্রশ্ন যাই দিক না কেন—তাই পারবে।' আপনার কথামতো চললে মিছিমিছি এনার্জী নষ্ট হতো। ওসব জীবনে কোন কাজে লাগত না। এনার্জীটা জমা ছিল, এখন খুব কাজে লাগছে। পরীক্ষা পাসের জন্য থোড়াই লাগে—আপনারা বৃষোৎসর্গের আয়োজন করতে বলেন।

আমি—আমি তো তখন টিউশনি করা ছেড়ে দিয়েছিলাম, বাবা। সময় পেতাম না।

তারাপদ—মাস্টারি করে বাড়িখানা তো বেশ করেছেন—বাহাদুরি আছে। তবে টিউশনি না করে কি হয়েছে? জায়গা কত কাঠা আছে? আড়াই কাঠা?

আমি—না, পাঁচ কাঠা, তখন হাজার টাকা করে কাঠা কিনেছিলাম—

তারাপদ—তাই বলুন, সস্তায় জায়গাটা পেয়েছিলেন। জানেন বোধহয়—আমরা ভবানীপুরেব পুরানো বাড়ি ভাড়া দিয়ে আট হাজার টাকা কাঠা দবে বারো কাঠা জায়গা কিনে লেকের কাছে নতুন বাড়ি করেছি,—যাবেন একদিন আপনার দুরন্ত ছাত্রের বাড়ি দেখে আসবেন। আপনি কবিমানুষ, আপনার খুব ভালো লাগবে।

আমি—তোমাদের সহপাঠী রমেন নিজের অর্জিত অর্থে বেশ ভাল বাড়ি করেছে—একদিন গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির অসুখ-বিসুখে রমেনকে খবর দিলেই আসে। তার বাড়িটা দেখেছ? অবশ্য তোমাদের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করছি না।

তারাপদ—দেখেছি দেখেছি, কিসে আর কিসে! কে বললে

HANDRA PUBLIC LIB.
36079

নিজের রোজগারের সব টাকা? খোঁজ নিয়ে দেখবেন—শ্বশুরই বেশির ভাগ টাকা নিশ্চয় দিয়েছে। নিজের রোজগার তো ভারী। নীচের ঘরগুলো তো হাসপাতাল বললেই হয়। আমার বাড়ি একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে দেখে আসবেন। বেশি দূর তো নয়। আচ্ছা, আপনার এই পাঁচ কাঠার কিছু খালি রাখেননি?

আমি—পিছনে দু কাঠা খালি আছে।

তারাপদ—রেস্‌পেক্‌টেবিলিটি রাখতে হলে সামনে ওই দু কাঠা খালি রাখতে হ'তো। একটু ফুলের বাগান হতে পারত। কবি-মানুষের বাড়ি বলে মনে হয় না। এ যেন একটা ছাপাখানাওয়ালার বাড়ি। আচ্ছা, বাইরের ঘরটা কি করে রেখেছেন, বলুন তো? যেন দপ্তরীখানা—কেবল ছাপা কাগজের বাণ্ডিল আব নিজের মতো জরাজীর্ণ রাশ-রাশ বই। একটা চৌকি আবার এর মধ্যে। চার খানা কেঠো চেয়ার। সোফা কোচ দিয়ে হাল ফ্যাশানে অনায়াসে সাজাতে পারতেন। পাঁচজন কালচার্‌ড লোক আসে হয়তো। বসবার ভালো ব্যবস্থা নেই, আজকাল সবারই বসবার ঘরে সোফা কোচ থাকে। তাতে কালচারের আর ডিসেন্সির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তো সেদিন দেখলাম বিপিন মাষ্টারের বাইরের ঘব সোফা কোচ দিয়ে তোফা সাজানো। বোধহয় ছেলের বিয়ে দিয়ে পেয়েছে। যাই হোক Refined taste আপনার কোন দিনই নেই—যেমন—আজো গোঁপ রাখেন, চাদর গায়ে দেন দেখেছি। সাতদিন অন্তর দাড়ি কামান তো? আজো নস্যি নেওয়ার ন্যাস্টি পণ্ডিতী হ্যাবিটটা আছে তো? আছে দেখছি—সামনেই নস্যির কৌটা রয়েছে। সিগারেট খান না কেন? কি আর খরচ! দিন এক টাকা তো।

আমি—সিগারেট খাই না—তা নয়, কেউ অফার করলে খাই বৈকি! মাসে কিন্তু এক টাকার বেশি নস্যি লাগে না।

তারাপদ—বাই জোভ। আপনাকে এই সিগারেটের টিনটা অফার ক'রে যাচ্ছি।

আমি—না, না, সিগারেটের নেশা ধরে যাবে, ও তুমি নিয়ে যাও। তুমি না হয় এক টিন ভিক্ষা দিলে, ফুরুলে তখন কি হবে?

তারাপদ—রাখুন স্যার, না খান কোন কালচার্‌ড লোক এলে অফার করবেন। এটাও একটা এটিকেট।

আমি—তোমার মতো কালচার্‌ড লোক তো বড় কেউ আসে না। তবে তুমি যে চেয়ারে বসে আছ তাতে পাঁচজন আই-সি-এস বসে গিয়েছেন। আর এই চৌকিখানার দোষ ধরছ,—প্রোফেসার সত্যেন বসু, ডাঃ সুরেন দাশগুপ্ত, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই চৌকিতেই বসে গেছেন। জানো তো আমার উপজীবিকা বই লেখা—কাজেই বইয়ের কাগজ, বইয়ের ফর্মা এবং বই দিয়েই ঘর ভরতি। ইঁদুরের উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্য চোখের সামনে রেখেছি।

তারাপদ—তা বটে—তবে আপ-টু-ডেট হবার জন্য চেষ্টাও তো করতে হয়, সমাজে থাকতে হ'লে। বিশেষতঃ আপনার একটা নাম আছে—ধামও তেমনি হওয়া তো চাই। আমার আফিসের সবাই আপনার নাম জানে। বাবার কাছে শুনেছি আপনাদের সময়ে স্কুল কলেজে বাংলা পড়ানোই হতো না—বাংলার পরীক্ষাও হতো না। আপনি এত বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?

আমি—মিশনারী স্কুলে ও কলেজে সাহেবদের কাছে ইংরাজী পড়েছিলাম—টোলের পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত পড়েছিলাম—তাতেই বাংলা লিখতে শিখেছি।

তারাপদ—বা চমৎকার উত্তর! এ হলো কি রকম—না, কি করে আপনার ঘা সারল? জবাব, ছোট বেলায় যে অনেক কুইনিন খেয়েছিলাম। আমার দরকার ভালো করে হিন্দী শেখার—পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত আর মৌলবীদের কাছে ফারসি শিখলে আমি ভালো হিন্দুস্থানী শিখতে পারব?

আমি—নিশ্চয়ই পারবে।

তারাপদ—কি যে বলেন স্যার, যাক, আপনার পেয়ারের

ছাত্রদের আপনি খোঁজ রাখেন, আমার খোঁজ আপনি কিছু তো রাখতেন না, আমি আজ নিজেই এলাম তাই মনে পড়িয়ে দিতে।

আমি—তোমার এক মামা বাণী-পীঠের শিক্ষক—তাঁর কাছে তোমাদের খবর পাই কিছু কিছু।

তারাপদ—আমার মামা ইস্কুল মা-ষ্টা-র বলেন কি স্যার!

আমি—কেন, সুরপতি গাঙ্গুলী?

তারাপদ—ও আই সী, তা মামা একরূপ বলা চলে, মায়ের খুড়তোতো ভাই। গরজ পড়লে মাঝে মাঝে যায় বটে।

আমি—তা ছাড়া, আমার প্রাক্তন ছাত্র দিবোন্দুর কাছেও তোমাদের খবর পাই। সে তোমাদের কে যেন হয়।

তারাপদ—কে, ব্যারিষ্টার দিব্যেন্দু?

আমি—হাঁ, সে তো প্রায়ই আসে, আমার ছেলের বন্ধু কিনা।

তারাপদ—সে তো আমার ভগ্নীপতি।

আমি—তোমার নিজের বোনগুলি তো ছোট ছোট।

তারাপদ—কাকার মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আমি—তোমার বাবারও তো কোন ভাই নেই, শুনেছি সুরপতির কাছে।

তারাপদ—বাবার মামাতো ভাই এটোর্নী সমরেশবাবুর জামাই দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু যাতায়াত করে—তাতো জানতাম না। কোনদিন তো বলেনি। আই-সী। বা! আপনার কলমটা তো বেশ দামী মনে হচ্ছে—দেখি দেখি হুঁ—একশো টাকার কম নয়। কোথা পেলেন? কে দিলে?

আমি—তোমারই সহপাঠী সুধীন এটা দিয়েছে।

তারাপদ—আমার এ কলমটার দাম কত জানেন? ১৬০৲ টাকা। আজকাল এর দাম ৩৫০৲ টাকা।

আমি—তোমার কলম তো নতুনই আছে, ও-ত শুধু সই করে—

ওর দাম দিন দিন বাড়বেই তো। আমার এ কলমের দাম খেটে খেটে এখন বিশ পঁচিশে নেমে গেছে।

তারাপদ—আমি যদি দিই—তবে সুধীনের চেয়ে ঢের বেশী দামের কলম দেব।

আমি—তারপর বাবাজী, এখন কাজের কথা হোক। বাজে কথা থাক। সতেরো বৎসর পরে গরীব শিক্ষককে তোমার অযথা অকারণে মনে পড়েছে বলে তো মনে হয় না। কি প্রয়োজন বল দেখি। স্কুলে কি তোমার ছেলেকে ভর্তি করতে হবে নাকি?

তারাপদ—আরে না-না, আমার প্রয়োজন সামান্য। আমাদের ছেলে-মেয়েকে বাঙ্গালী ইস্কুলে পড়াই না। বাবা ভুল করেছিলেন,—বিলাত না গেলে আমার ইংরাজি ভালো করে শেখাই হতো না। আমাদের একটা ক্লাব আছে—তাতে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব হবে। আপনাকে সভাপতি হতে হবে। আমি গাড়ি এনে আপনাকে নিয়ে যাব আবার পৌঁছেও দেব। ট্রামে বাসে যেতে হবে না।

আমি—তাই নাকি? আমি তো কোন সভায় যাই না বাবা, আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ সভায় শোভা পায় না।

তারাপদ—সেকি? সভাপতিত্ব করতেও যান না? মেম্বাররা যে এ জন্য বড় বড় লোকের কাছে গিয়েছিল—তাঁরা সব এনগেজ্‌ড্‌। আমি জোর দিয়ে বললাম—আমার মাষ্টার মশাইকে আমি নিয়ে আসছি।

আমি—গলায় গামছা দিয়ে টেনে—?

তারাপদ—আমি যে সেক্রেটারি, আমার তো মান থাকবে না, স্যার। আপনার কোন কষ্ট হবে না। কে কেউ বলেছিল বটে—তিনি আসবেন না—আমি ধমকে বলেছিলাম, আসবেন না? আমি গেলেই রাজী হবেন।

আমি—তুমি যে ভার নিলে তা কোন ভরসায়? সতেরো বছর তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—সুস্থ আছি কিনা—লোকান্তরে আছি কি দেশান্তরে আছি। অন্য কোন জরুরি কাজে লিপ্ত

আছি কিনা—অন্য কোথাও কথা দিয়ে রেখেছি কিনা তার কোন খোঁজ না নিয়ে ভার নিলে কেন, বাবা? তোমারই বিবেচনার ভুল। ভাবলে এত বড় সম্মান ছাড়তে পারব না?

তারাপদ—দেখুন—আমি ইচ্ছা করলে আপনাদের সবচেয়ে যিনি বড় সেই হেমেন্দ্রনাথ ঘোষকে সভাপতি করে আনতে পারি—যদি বাবার সাহায্য নিই। তা নিতে চাই না। মুশকিল হয়েছে আর কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আপনাদের সম্মান দিলেও আপনারা সম্মান নিতে জানেন না—আর এদিকে বলেন, শিক্ষকদের কেউ সম্মান করে না। এর বেশি কি সম্মান আপনাদের দিতে পারি? কার্ড ছাপতে পাঠিয়েছি তাতে আপনার নাম সভাপতি বলে লেখা হয়েছে—যাই কার্ড ছাপা বন্ধ করিগে। চিরকালই একগুঁয়ে জেদী হয়েই থাকলেন—টরপেডো এই প্রথম লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তরুণ বলেছিল বটে, 'ওঁদের দিন ফুরিয়ে গেছে—ওঁরা আর সভায় আসতে সাহস করেন না। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে অপমানের ভয় আছে। এমন কি—' ওঁদের কাছে যাওয়া ঠিক নয়—তার কথা না শুনে ভালো করিনি। সে অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম করছিল—এখন তাঁরি খোঁজে চলি তবে।

আমি—বৎস! এত অল্প বয়সে তাঁর খোঁজে যেও না। রবীন্দ্র জয়ন্তীর জন্য সাহিত্যিকের কী প্রয়োজন? যে কোন পদস্থ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হলেই তো চলে। রামেন্দ্রসুন্দর কি প্রমথ চৌধুরীর কি সত্যেন দত্তের স্মৃতিসভা করতে হলে অবশ্য সাহিত্যিক চাইই, রবীন্দ্রনাথের সভার জন্য সভাপতির অভাব হবে না। তোমার বাবাই তো রয়েছেন। দেশে সাহিত্যিক ৫০।৬০ জন আছেন, কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে ৫০ হাজার জায়গায়। সব সভায় কি সাহিত্যিক পাওয়া সম্ভব?

শ্রীমান তারাপদ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা হুঁ বলে মোটরে গিয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরালো।

পুত্রদায়

পার্কে অনেকগুলি বৃদ্ধ সকালে-বিকালে বেড়াতে আসেন, তাঁরা পাশাপাশি দুটি বেঞ্চে বসে নিজেদের সাংসারিক জীবনের গল্প করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পেনসনপ্রাপ্ত—কেউ কেউ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। আর আছেন দুই-একজন আইনজীবী। তাঁদের তো মৃত্যুর আগে অবসর গ্রহণ নেই, তাঁরা কবে আদালত থেকে স্ট্রেচারে চড়ে বাড়ি কিংবা হাসপাতালে যাবেন, তারই প্রতীক্ষায় কাজকর্ম বিশেষ না থাকলেও আদালতে এখনো যান।

আমি এঁদের দেখি আর ভাবি এঁরা কেমন সুখী, বার্ধক্যের বিশ্রাম ভোগ করছেন, আমার কপালে বিশ্রাম নেই। আমি ভাবতাম, এঁরা সকলে বসে বোধহয় চৈতন্য-চরিতামৃত, ভাগবত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন,—এই ভয়ে তাঁদের কাছে ঘেঁষি না। তাছাড়া, আমি একটা চক্কর দিয়েই চলে আসি বাড়িতে—প্রুফের তাড়ার তাড়া রয়েছে। এই চিন্তা প্রুফের আলপিনের মতো বিঁধতে থাকে।

সেদিন তাঁদের বেঞ্চির এক কোণে বসেই পড়লাম। তারপর তাঁদের আলোচনা কানে গেল। একজন বললেন—চৌধুরী ম'শায়, জায়গাটা আর কতকাল ফেলে রাখবেন, বাড়িটা শুরু করে দিন।

চৌধুরী—আর বাড়ি! ও আর আমার দ্বারা হলো না। জায়গাটা বিক্রী করেই দেব। বাড়ি কি আর করতে হতো? ছেলে বিয়ে করলে শ্রীনাথ মজুমদার তো তার বারোটা বাড়ির মধ্যে একটা বাড়িই দিতে চেয়েছিল। ছেলে বেঁকে বসল—বললে, আমার শ্বশুরের দেওয়া বাড়িতে তোমরা গিয়ে বাস করবে? এতে তোমাদের মানমর্যাদা থাকবে?

আমি বললাম—কেন—তাতে হয়েছে কি? বেটা বলে কিনা

'ও-বাড়ি তো তার মেয়ের নামে লিখে দিতে চায়—উদ্দেশ্য শুধু মেয়ে-জামাই ও-বাড়িতে গিয়ে থাকুক। তোমরা আমাকে পৃথক করে দিতে চাও ?'

মধু ঘোষ—বেশ তো ! সে-বাড়িটা নিয়ে ভাড়া দিলেই হতো, তাতে তোমার এ-বাড়ির ভাড়াটা উশুল হয়ে যেত। সে-বাড়িতে বাস করতেও হতো না। তাতে যে টাকাটা জমতো তাতেই ধীরে ধীরে বাড়ি হয়ে যেত।

চৌধুরী—তাও বলেছিলাম, বেটা বলে—'দানের বাড়ি ভাড়া দেওয়া ? তাই বা কেমন ক'রে হয় ? দুপক্ষের আত্মীয়-স্বজনে বলবে কি ?' রাগ করে বিয়ে ভেঙে দিলাম। ফল্স্ প্রেসটিজ ! আরে বাপু বাড়িওলার উপদ্রব থেকে তো বাঁচা যেত। ইকনমিকসে এম-এ পাস কি না,—তাই বুঝলে না।

ঘোষ—বিয়েটা ভেঙে দিয়ে ভালো করেননি—বাড়ির দামের টাকা পণ হিসাবে নিয়ে কেনা জায়গায় বাড়ি করলেই পারতেন।

চৌধুরী—সেই রকমই কথাবার্তা হচ্ছিল—ইতিমধ্যে কর্তা এক গরীব মাস্টারের কন্যাদায়োদ্ধার করলেন। উপযুক্ত ছেলে, তার সঙ্গে বিরোধ করা যায় না। কি বলো নীলু।

নীলু রাহা—সেই তো হয়েছে 'মুস্কিল', আমার ছেলের বিয়েতে আমি একটা মোটর চেয়েছিলাম। কন্যার পিতা দিতে রাজীও হয়েছিল। ছেলে বেটা বললে—একটা হাতি যদি দিতে চায় তো তাই নিতে হবে নাকি ? শ্বশুর কি ড্রাইভারের মাইনে দেবে ? পেট্রোলের দাম দেবে ? মাসে মাসে বিল পাঠাতে হবে নাকি ?

আমি বললাম—তবে যা ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে আপিসে। অফিসার হয়েছিস এখন মোটর না হ'লে চলে কি ? ঘোড়া হ'লে কি চাবুকের জন্য আটকায় ? তা আর হলো না। আজো সে বিয়েই করেনি। মেজোটা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে দুর্গাপুরে চাকরি পেল—তার বিয়ের সম্বন্ধ করলাম—খুঁজে খুঁজে এক বড়লোকের একমাত্র

মেয়ের সঙ্গে। তার প্রচুর সম্পত্তি, বাড়িঘর সবই পেত। ছেলে বললে মেয়ে লেখাপড়া জানে না, ম্যাট্রিকও পাশ করেনি—এ মেয়ে আমি বিয়ে করব না। এত বড় বোকা ছেলে কখনো তোমরা দেখেছ? বললাম—বিয়ের পর বৌকে স্কুলে ভর্তি করলেই চলবে। ছেলে বললে—একটা চর্বির গোলা, মাখনের পুতুল, আদুরে দুলালীকে লেখাপড়া শেখানো অসম্ভব। কিছুতেই রাজী কবাতে পারলাম না। সেজোটা তখন বি-এস-সি অনার্সে পাস করে এম-এস-সি পড়ছিল। তার বিলাত যাওয়ার ঝোঁক। তাকে রাজী করালাম বিলাত পাঠানোর লোভ দেখিয়ে অনেক বলে কয়ে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে। কিন্তু মেয়ের বাপ রাজী হলো না। সে তৈরি ছেলে চায়। হাতছাড়া হয়ে গেল মস্ত বড় দাঁওটা। ঐ মেয়েব বিয়ে হয়েছে অন্য একজন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে কবি ঠিকই বলেছেন—"এ জগতে হায় সেই আবো পায় আছে যার ভারী ভুঁড়ি।" আচ্ছা বলো তো—লেখাপড়া শিখলে বিদ্যা হয়, কিন্তু বুদ্ধি কি লোপ পায়?

ঘোষ—বড় ছেলে তো তোমার আজো বিয়ে কবেনি। মেজো ছেলের বিয়ে হয়েছে?

নীলু—বিয়ে হয়েছে বৈকি?

ঘোষ—কই? আমরা জানতে পারলাম না—একটা নিমন্ত্রণও করলে না।

নীলু—নিমন্ত্রণ করবাব কি উপায় ছিল ভাই। ও একজন এম-এ, বি-টি হেডমিস্ট্রেসকে বিয়ে কবে নিয়ে এলো। মেয়ে বয়সে বড়, আমবা বলি দুজনায় একবয়সী। আমি বিয়ে দিতে যাইনি, ওর মামা আব ছোট কাকা বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো।

ঘোষ—এক জাত—না—ভিন্ন জাত?

নীলু—জাতটা দৈবগত্যা একই বটে, তবে সগোত্র।

চৌধুরী—এতে একবারে তোমার লোকসান হয়নি। বৌমা

চাকরি নিশ্চয়ই ছাড়েনি। যা হোক তুশো-আড়াইশো টাকা অন্ততঃ মাসে আনছে তো?

নীলু—তুমি ক্ষেপেছ? বিয়ের সর্ত কি জান? চাকরি করতে দিতে হবে,—আর যতদিন ছোট ভাইরা উপার্জনক্ষম না হবে ততদিন মাইনেটা সব উদ্বাস্তু বাপ-মাকে দিতে হবে। আমরা নিতে পারব না। বলো কেন?

দীনু দত্ত—তবে শোনো, এক মাস্টারের মেয়েটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা দেখে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। মাস্টারের একপাল ছেলেমেয়ে। আমি বেশ বুঝতে পারি, দেড়শো টাকা করে মাসে মাসে তার বাড়িতে যাচ্ছে। তোমার তো বৌ-এর আয়টাই শুধু যাচ্ছে। আমার ছেলের মাইনের অনেকটাই যাচ্ছে। বেনো জল ঢুকে পুকুরের মাছগুলোও বার করে নিচ্ছে।

মুখুজ্যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—আমার বড় ছেলে অনন্ত এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ভালো করে পাস করে প্রোফেসার হয়েছে, তা তোমরা জানো। অনেক দিনের কথা। তার খুব ভাল সম্বন্ধ এলো।

ঘোষ—তোমার ছেলেগুলি তো এক একটি রত্ন হে। তোমার বাড়ি তো রত্নাকর, গিন্নী তো র গর্ভা।

মুখুজ্যে—রত্ন কেমন, তা তোমরা জহুরী, সব কথা শুনলেই বুঝবে। মেয়েটি বি-এ পড়ছিল, দেখতে খুব ভালোই। অনন্তকে বললাম—নিজের চোখে যা দেখে আয়। সে বললে—তোমরা সবাই দেখেছ আমি আর কি দেখব? শুনে গৌরব অনুভব করলাম। বুঝলাম—ছেলে একেলে ছেলের মতো নয়। তখন বেয়াইএর সঙ্গে দেনা-পাওনার কথা যা চলছিল, তা আর ওকে জানালাম না। বিলাত পাঠাব বলে বেয়াইকে চাইলাম ছয় হাজার টাকা নগদ, এমন বেশী কিছু নয়। গহনাপত্র বা আসবাবপত্রের সম্বন্ধে কিছুই বললাম না—জানি কোন বাপই মেয়েকে ফাঁকি দেয় না পণ যতই দিতে হোক। আমার উদ্দেশ্য

ছিল ছেলের জন্য তেতালায় বেশ একটা বড় ঘর করা। এ টাকার একটি পয়সাও আমি সংসারে নিতাম না, ঐ হতভাগার জন্যই ব্যয় করতাম। দু হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে কাজ শুরু করেও দেব মনে

তোমাব বাড়ি তো বত্নাকর

করেছিলাম। আশীর্বাদেব দিন ঠিক হয়ে গেল। ছেলে কার কাছে পণ-যৌতুকের কথা শুনে এসে একদিন বললে—বাবা, তুমি নাকি আমার

বিয়েতে অনেক টাকা পণ নিচ্ছ? আমি বললাম—নিচ্ছি তো। তবে টাকার পরিমাণটা কম করেই বললাম, তোর বিলাত যাওয়ার খরচ। ছেলে বললে—না। আমি বিলাত তো যাব না—এখানেই থিসিস পেশ করব। আমি বললাম—তা না যাস নাই যাবি। তোর একখানা ভদ্রগোছের শোবার ঘর তো চাই—তাতে চার হাজার টাকা খরচ পড়বে জানিস, তাই টাকাটা নিচ্ছি। ছেলে জবাব দিলে—আমি তো বাইরের ঘরেও থাকি না, বারান্দাতেও থাকি না, আমার শোবার ঘর তো রয়েছে। আমি বললাম—ও তো ছোট ঘর। রাশ রাশ বইয়ে ভর্তি। তোর হবু শ্বশুর ঘর সাজিয়ে অনেক টাকার আসবাবপত্র দিতে চায়। আমি বাপু চাই-টাইনি। সে তার মেয়ের ঘবটা সাজাতে চায়। আসবাবপত্রের জন্য একটা বড় ঘর তো চাই বাপু। রাখবো কোথা?

ছেলে বললে—আমার ঘর সাজানোর আসবাবপত্র-তো বই। তা বই যদি দিতে চায়—আমি একটা লিস্ট করে দেব। আর কিছু চাই না। আমি বললাম—তোর বোনের বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করলাম, আর আমি নেব না? আমাকে পীড়ন করে অন্যে আদায় করে নেবে আর আমি নিলেই দোষ হবে? ছেলে বললে—বাবা, এ কি একটা যুক্তি? আপনার মেয়ের বিয়ের খরচা ছেলের শ্বশুর দেবে? না বাবা, আমি আপনার পায়ে ধরি—আমি অধ্যাপক, অন্যের যা সাজে আমার তা সাজে না। বিয়ে করে পণ নিলে ছাত্র-সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

আমি বললাম—তবে এ বিয়ে আমি ভেঙে দিই? বলি, ছেলে বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। অনন্ত বললে—তোমরা যখন ঠিক করেছ তখন এই বিয়েই হবে, কিন্তু পণ না, আসবাবপত্র না। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল—অনন্তর মা শয্যা গ্রহণ করলে। বিয়ে হয়ে গেল নমোনম করে।

ঘোষ—দু হাজার টাকা যে অগ্রিম নিয়েছিলেন তা ফেরত দিলেন তো?

মুখুজ্যে—দিতে গিয়েছিলাম ভাই, বেয়াই বললে—এর কথা আপনি আর আমি ছাড়া কেউ তো জানে না। ওটা আর ফেরত দিতে হবে না। মেয়ে-জামাইও জানবে না। সোনার চাঁদ ছেলে, আমার পরম সৌভাগ্য অমন দেবতুল্য জামাই পেয়েছি। আমি মনে মনে বললাম, তোমার কাছে তো দেব, আমার কাছে যে দৈত্য। ওকি সংসারের কম ক্ষতি করল!

ঘোষ—ছেলেকে কতকগুলো বই কিনে দিলেন নাকি!

মুখুজ্যে—ক্ষেপেছ? বই-এর গাদায় ওর ঘর ভরা। সে টাকা বিয়েতেই খরচ হয়ে গেছে। দেড় হাজার টাকার জিনিস তো বৌমাকেই দিয়েছি। তারপর মেজো ছেলে বসন্ত—আই-এ-এস পাস করার পর তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল বড় বড় জায়গা থেকে। এ রত্নটির গুণের কথা শোন। পাত্রীটি সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী। আমরা অমল রায়কে দেনাপাওনা ঠিক করতে বললাম। অমল বললে—দেখুন, আমি গহনা ছাড়া ছয় হাজার টাকার জিনিসপত্র দেব, আপনারা কি কি নেবেন তার তালিকা করে আমাকে দিন, নগদ না নিলেই ভালো হয়। নগদ পণটা নেওয়া নেহাত অসভ্যতা। পণ বলে নয়—মেয়ে-জামাইএর আশীর্বাদী হাজার দুই টাকা দেব। আমরা দেখলাম—বড়টা না হয় অধ্যাপক। এতো সরকারী চাকুরে, এ নিশ্চয়ই যৌতুক পণে খুব খুশীই হবে। আমরা দু' মাস ধরে স্বামী-স্ত্রী মেয়ে-জামাই সবাই মিলে রেফ্রিজারেটার, রেডিও-সেট থেকে পাপোশ পর্যন্ত কিছুই ফর্দে বাদ দিলাম না। আমাদের হিসাবে সাড়ে সাত হাজার হয়ে গেল—মুখে ছয় হাজারই জানানো হলো। বসন্ত ছুটিতে বাড়ি এলো পাটনা থেকে। মেয়েও ইতিমধ্যে বি-এ পাস করেছে। আশীর্বাদের দিন ঠিক করাও হলো।

একদিন বসন্ত তার অধ্যাপক মিত্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেল। বাড়িতে বলে গেল—দুদিন তাঁর সঙ্গে বাহিরে যাচ্ছে একটা সভা করতে। তারপর দিন এক টুকরো কাগজের বমশেল এসে

পৌছল। 'অধ্যাপক মিত্রের মেয়েকে রেজেস্টারি করে কাল বিয়ে করেছি। যদি অনুমতি দেন বাড়িতে যাই, নইলে সস্ত্রীক পাটনা চলে যাব।' অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী যে আমি নই তা বলাই বাহুল্য। আমি লিখলাম, 'তুমি আপাততঃ পাটনাতেই যাও।' ছেলেটাকে একেবারে হাতছাড়া করা ঠিক নয়। রাগারাগি করলাম না। অধ্যাপকটি কি কম ধড়িবাজ—আমার ছেলেকে ভুলিয়ে একটা সমবয়সী কালো মেয়েকে আমার ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, হলোই বা এম-এ পাস। পাওনার কপাল না থাকলে এই রকমই হয়।

চক্রবর্তী—ওহে ভায়া, ঐ রকম লিস্ট আমিও করেছিলাম বড় ছেলের বিয়েতে দাবি করব বলে। ৫১টা দুয়ার জানলার পর্দা পর্যন্ত ধরেছিলাম। সম্ভাব্য শিশুর জন্য পেরামবুলেটার পর্যন্ত, শেষে নেবার জিনিস আর খুঁজে পাই না। কি করব? মেয়েটিও খুব রূপবতী ও গুণবতী। ছেলেরও সম্মতি ছিল। আশীর্বাদের জন্য ছেলেকে ডেকে পাঠানো হলো। চিঠি এলো—বোম্বাই থেকে। লিখল—ভেবে দেখলাম —আমার যা আয় তাতে আপাততঃ বিয়ে করা সম্ভব নয়।

মেজো ছেলে এম-বি পাস করলে বিয়ের সম্বন্ধ এলো, কন্যার পিতা—মধু বাঁড়ুজ্যে—বললে—'বিলাত থেকে বড় ডিগ্রী নিয়ে আসুক। তার চেম্বারের জন্য রাস্তার উপর আমার বাড়ির দুটো ঘর ছেড়ে দেব এবং দশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেব।' ছেলে বিলাত গেল—সেখানকার ডিপ্লোমা দু-তিনটা পেলে। ইত্যবসরে মেয়েও বি-এ পাস করল। ছেলে ফিরল একটা পোলিশ মেয়েকে বিয়ে করে—একেবারে চাকরি নিয়ে নাগপুরে। মায়ের কাঁদাকাটায় বাড়ি এসেছিল পর বৎসর, মেম-বৌ-এর সুখ্যাতি আর ছেলের মায়ের মুখে ধরে না—এমন লক্ষ্মী বৌ, এমন শান্ত নিরীহ ভদ্র মেয়ে আমাদের জাতে নেই। সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, কিছু বাংলা শিখেছে। আমি তো চোরের মত সমাজে চলাফেরা করি সেই থেকে। তবে আমি একবারে এ অঞ্চলে একঘরে নই—আমার দলে আজকাল

অনেকেই আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ছেলেরাও মেম-বিয়ে করে ফির্‌ছে। মধু বাঁড়ুজ্যে এখন তো আমায় দেখলেই হাসে।

ঘোষ—ওঃ—এ খবরটা বেশ জবর বটে, এতদিন এটাকে কবর দিয়ে রেখেছিলেন? আপনার বড় ছেলে আর বিয়ে করল না? তার আয় বেড়েছে তো?

চক্রবর্তী—শুনেছি বোম্বাই-এর এক ফিল্ম-এক্‌ট্রেসকে বিয়ে করেছে। বৌমাকে চোখে দেখিনি।

মণি দত্ত—আপনাদের চেয়ে আমি বরং ভাল আছি। আমি চার ছেলের বিয়ে দিয়েছি—স্বজাতির মধ্যে, পণও সম্ভবমতো পেয়েছি—গহনাও পেয়েছি,—চার ছেলেব শ্বশুররা চাঁদা ক'রে আমার বাড়ি ঘর সাজিয়েও দিয়েছে। বৌমারা বিদুষী নয় বটে, তবে গুণবতী। আমার ছেলেরা বেশী লেখাপড়া শেখেনি, কাজেই বিয়ের ব্যাপারে কোন বিষয়ে কেউ অমত করেনি। ডেকে বলেছি, টোপব পরে চল, তোর বিয়ে দিয়ে আনি। অমনি গিয়ে সুড়সুড় করে টোপর পবে পিঁড়ির ওপর বসেছে ছাদনা তলায়। যা পেয়েছে তাতেই ধন্য হয়ে গেছে।

মুখুজ্যে—তুমি ভাগ্যবান ভাই। এখন দেখা যাচ্ছে ছেলে বেশি লেখাপড়া শিখলে বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মাদের না থাকাই ভালো।

ঘোষ—একদিন ছেলেদের বিয়ে হতো উপার্জনক্ষম হবার আগে, তখন বাপ-মার কথা খাটত—এখন আর সেদিন নেই। আমাদের বিয়ে হয়েছিল পঠদ্দশাতেই, তখনও আমরা সাবলম্বী হইনি। তাই বলে এখন পঠদ্দশাতে বিয়ে দেওয়া তো চলে না—কলেজের পড়ুয়া ছেলেকে লোকে কন্যাদানই বা করবে কেন? ছেলেরাই বা রাজী হবে কেন? অনিয়মিত বিয়ের অপরাধে কৃতী ছেলেদের ত্যাগ করাও তো যায় না! সমস্যা খুবই জটিল।

গুপ্ত—যাই হোক। বাপ-মা ছেলেদের মঙ্গলই চায়—যাতে তাদের ভালো হয়, যাতে তাদের আর্থিক সুবিধা হয়—বাপ-মা তাই তো খোঁজে। ছেলেরা তা বোঝে না—এ কি বিত্তেরে, বাবা!

চৌধুরী—আর একটা মজা দেখেছ—আমরা যেসব মেয়ে পছন্দ করি, ওঁদের পছন্দ-করা মেয়েরা দেখতে তাদের চেয়ে ঢের খারাপ। আজকাল পণযৌতুক, কুলশীল সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। গায়ের রঙটাও গণনার মধ্যে আনে না। ওরা দেখে হাইট, ওয়েট, স্মার্টনেস, এডুকেশন আর কালচার অর্থাৎ অভিনয়, নাচ, গান, আরো কত কি! মেয়ে নির্লজ্জ না হলে ওদের পছন্দ হয় না।

মুখুজ্যে—পণযৌতুকের যেন কোন দামই নেই—বাড়ির যে সম্পদ পণযৌতুকের দ্বারা আমরা বাড়িয়ে দিতে চাই—তা তোরা সারা জীবনে রোজগার করেও করতে পারবি না। যার আছে, তার কাছে কন্যার প্রাপ্যটা আদায় করায় দোষটা কি? পুত্র-কন্যা দুইই সমান—এ বোধ যদি কারো জন্মে না থাকে তবে কিসের সভ্যতা? শ্বশুর কি পর? সে তো দ্বিতীয় বাপ। সে যদি দেয় তার মেয়ে-জামাইকে, তাতে আপত্তি হয় কি করে বুঝি না। বেশ ব্যবস্থা চলছে কিন্তু, মেয়ের বিয়ের সময় দাও অষ্ট হাজার আর ছেলের বিয়েতে পাও অষ্টরম্ভা। কী কুশিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার নামে!

চক্রবর্তী—এখন যে কাল পড়েছে তাতে বিলাতী বাপের মতো ছেলেদের কাছে কিছুই প্রত্যাশা কোরো না—তাদের মানুষ করে ছেড়ে দাও, যেমন মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার কাছে প্রত্যাশা করা হয় না। তবে কোন ছেলে যদি বাধ্য হয়ে থাকে, ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করে তুলবার জন্য নিজের আরামবিলাস একটু স্যাক্রিফাইস করে, বাপ-মাকে আর্থিক সাহায্য করে তবে সৌভাগ্য বলেই মনে কোরো, কিন্তু প্রত্যাশা কোরো না। প্রত্যাশা না করে আগে থেকে সতর্ক হতে হবে। ছেলে অর্জনক্ষম হয়ে মেম, খ্রীষ্টান মেয়ে, ব্রাহ্মিকা, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, কিংবা অন্য জাতের মেয়ে, বিধবা, ছেলেপুলের মা—কাকে যে বিয়ে করবে তার ঠিক নেই, তার জন্য মনকে প্রস্তুত করে রাখ, ভেঙে পড়ো না, হায় হায় কোরো না, নিজের মৃত্যুকে আগিয়ে এনো না। যুগের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে

সন্ধি করো। ছেলেদের বিলাত যদি পাঠাও তবে তাদের ছোটভাই-বোনের জন্য সংস্থান রেখে বিলাতের খরচা যুগিয়ো, জীবনবীমার প্রিমিয়ামটা ঠিকমত দিয়ে যেও। সামাজিক পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে গো-গাড়ির গতিতে এলে আঘাতটা পেতে হতো না—স্বাধীনতার মতো একেবারে বিমানে চড়ে পরিবর্তনটা হুড়মুড় করে এসে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের অনিয়মিত বিবাহের জন্য লজ্জা পাওয়ার কালও বিগত। এখন তো ঘরে ঘরে সার্বজনীন ভিত্তিতে বিবাহ চলেছে। যুগটাই সার্বজনীন প্রকৃতির। পণযৌতুক লাভের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ত্যাগ কর। একান্নবর্তিতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তা আর নতুন করে গড়ে তোলা যাবে না।

মণি দত্ত—সর্বনাশ! তা হলে তো হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংসারও চুরমার হয়ে যাবে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও আর থাকবে না। দেশটা যে বড়ই গরিব, ভাই! এ দেশের সমাজসংসার স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়-বাৎসল্যের উপরই আজও টিকে আছে। কেউ কারো কাছে প্রত্যাশা না করলে ক'জন এই গরিব দেশে মানুষ হয়ে উঠত? আপনারা কৃতবিদ্য হয়েছিলেন একদিন, হিসাব করে বলুন তো—আপনাদের ক'জন কেবল পিতার অর্থে কৃতবিদ্য হয়েছেন? আমি তো শ্বশুরের সাহায্যে শেষ দুই বছর কলেজে পড়ি—চাকরিও মেসো করে দিয়েছিলেন। অনেকেই তো কাকা, দাদা, মামা, পিসী, মাসীর অনুগ্রহে মানুষ হয়েছেন। এই অল্প আয়ুর দেশে ক'জনের বাপ ছেলেপুলেদের মানুষ করে যেতে পেরেছেন? আপনাদের যুগপ্রগতিতে দেখছি আমিই ব্যাকওয়ার্ড। আমি ভাই বেশ সুখেই আছি। পিতামাতার ভক্ত চার ছেলে সংসারী হয়ে পরম সদ্ভাবে মিলে মিশে সংসারধর্ম প্রতিপালন করছে—সংসারে কোন অভাব নেই, আবার ভোগবিলাসের আতিশয্যও নেই। এই দেখে আমি তো বিদায় নিই তারপর পৌত্রেরা যা হয় করবে।

স্বজনপ্রীতির অভাব ও প্রচণ্ড ভোগলোলুপ স্বার্থপরতার জন্য

শিক্ষিত সমাজের দারিদ্র্য এত বেড়ে গিয়েছে। আর্থিক বৈষম্য আগেও ছিল, স্বজনপ্রীতি তা অনেকটা দূর করেছিল—এজন্য আইন করতে হয়নি, আন্দোলন করতেও হয়নি। এ সমাজে বাঁচার অর্থ ছিল স্বজনগণকে বাঁচিয়ে বাঁচা, নিজেকে স্বতন্ত্র করে বাঁচবার জন্য সোনার খাঁচা বানানো নয়।

গুপ্ত—সর্বনাশ করেছে ঐ সিনেমা আর বাংলা উপন্যাসগুলো।

চৌধুরী—কবিদেরই বা বাদ দিচ্ছ কেন? চোখের নেশাকে কবি ও ঔপন্যাসিকরা প্রেম প্রেম বলে চীৎকার করে একটা আর্টিফিশিয়াল স্যাঙ্কটিটি আরোপ করে দেশের সর্বনাশ করছে। প্রেম না শেম! তারা মোহ ও লালসাকে দেবদুর্লভ মহিমার মায়াজালে জড়িয়ে যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে।

শেষকালে নেপথ্যে গালাগালি খেয়ে সেখান থেকে উঠলাম—এই হলো এঁদের চৈতন্যলাভের চৈতন্য-ভাগবত।

ছাপার ভুল

বাংলা ভাষায় যা-কিছু ছাপা হয়, প্রায় সব তাতেই ছাপার ভুল পাওয়া যায়। কোন কোন লেখা ছাপায় ভোলানাথের ঝুলি হয়ে ওঠে। কি বই, কি সংবাদপত্র, কি প্রশ্নপত্র, কি সূচীপত্র, কি নিমন্ত্রণ-পত্র, কি বিজ্ঞাপন, কি মানপত্র—নির্ভুল ছাপা খুবই দুর্লভ।

আমার নিজের ছোট নামটিই নিবন্ধের বা কবিতার শিরোনামার সঙ্গে অথবা সূচীপত্রে নানান বানানে ছাপা হয়। একবার এক সভায় প্রস্তাবক আমার নাম সভাপতিত্বের জন্য প্রস্তাব করতে গিয়ে বলেছিলেন, কালীশেখর কবিদাস রায়। এটা তাঁর রসনাস্খলন মাত্র। আমার নামের ঐরূপ বিপর্যস্ত শব্দবিন্যাস একটি মাসিক পত্রের সূচীপত্রে কালি দিয়ে হাতে সংশোধিত হয়ে আমার হাতে পৌঁছেছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাম 'বরীন্দ্রনাথ' ছাপা অনেক স্থলেই দেখেছি। শাস্ত্রী মহাশয় অনেক ক্ষেত্রে শান্ত্রী মহাশয় হয়েছেন। শাস্ত্রীরা শাস্ত্রের, বিশেষ করে সমাজের শান্ত্রী (Sentry) সন্দেহ নেই—কিন্তু কোন শাস্ত্রীই ছাপায় শান্ত্রী হতে রাজী হবেন না।

নিমন্ত্রণপত্রের প্রুফ দেখানো হয় না, কাজেই নির্ভুল ছাপা নিমন্ত্রণপত্র পাওয়া যায় না। একখানি নিমন্ত্রণপত্রে নিমন্ত্রকের নাম ছাপা দেখেছি প্রথমনাথ বিশ্বাস। একখানিতে দেখেছি প্রথমা কন্যা কলমা (কমলা ?)। একখানায় বরের নাম পেয়েছি সুরতকুমার। এই নামটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল, খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে সুরত নয়, সুরথ। কালি দিয়ে কেটে সৌষ্ঠবের সঙ্গে মুদ্রিত পত্রের অঙ্গহানি করা হয়নি। তাছাড়া, সুরত শব্দের অর্থ পত্রপ্রেরক জানতেন না। একখানা পত্রে নিমন্ত্রকের উপাধি ছাপা হয়েছিল—

বরাটের স্থলে রবার্ট। বরাট অপেক্ষা রবার্ট আখরিয়ার (কম্পোজিটারের) সুপরিচিত। লিখেছিলাম—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা একহাতে বাইবেল, অন্য হাতে শেক্সপীয়র নিয়ে এদেশে আবির্ভূত হয়েছিল—প্রুফে ছাপা হয়ে এলো বাইবেলের স্থলে রাইফেল। এখানে আখরিয়া সঙ্গততর শব্দই বসিয়েছেন। ঘুণাক্ষরন্যায়ে আমার ত্রুটিটা সংশোধিত হল। এ নিয়ে দু' লাইন কবিতা লিখলাম—

দেখিলাম প্রুফে বাইফেলরূপে বাইবেল পরিণত।
কম্পোজিটার কাঁচা বটে তবে রসময় রীতিমত।

লিখেছিলাম—'এই দিনে ভক্তগণ খোল-করতাল বাজিয়ে উদ্দণ্ড কীর্তনে নর্তন করে।' ভক্তগণের স্থলে প্রুফে ছাপা হলো ভণ্ডগণ। কাটতে ইতস্ততঃ করতে হলো। কাপি ও প্রুফের মধ্যে কে সত্য বহন করছে বলা কঠিন। লিখেছিলাম—'নিরস্ত্রীকরণে'র কথা। ছাপা হলো বিবস্ত্রীকরণ। লক্ষ্যার্থে বিচার করলে কোন ভুল হয়নি। শীতাতপ ও লজ্জার হাত থেকে রক্ষার অস্ত্রই তো বস্ত্র। অস্ত্র কেড়ে নিলে বস্ত্রই কেড়ে নেওয়া হয় না কি? লিখেছিলাম—'নিত্যানন্দের নেতৃত্বে এই দৈন্য দিয়াই বৈষ্ণব ভক্তগণ সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।' ছাপা হলো 'সৈন্য দিয়া'। আখরিয়া হয়ত ভেবেছেন—সৈন্য ছাড়া কি করে জয়লাভ করা যায়?

লিখেছিলাম পাঠ্যপুস্তকে—'স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যায়াম পরম হিতকর।' ব্যায়ামের স্থলে ছাপা হলো ব্যারাম। আখরিয়া হয়ত ভাবলেন, স্বাস্থ্যের সঙ্গে তো ব্যাবামেরই সম্পর্ক বেশি।

সেদিনও একটি মাসিক পত্রের এক প্রবন্ধে লিখেছিলাম—বকাণ্ড প্রত্যাশা—ছাপা হলো প্রকাণ্ড প্রত্যাশা। সম্পাদক বললেন—'প্রুফরীডার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বকাণ্ডের অর্থ কি? আমি বললাম—ওটা প্রকাণ্ড হবে।' ব্রহ্মাণ্ড কিংবা অশ্বাণ্ডও হতে পারত। অশ্বাণ্ড হলে অর্থের ক্ষতি হ'ত না। যাই হোক,—বকাণ্ড তিনবার ভুল ছাপা হ'ল: আর এ শব্দ ব্যবহারই করব না।

যৌবনকালে এক কবিতায় লিখেছিলাম—

তৃষিত অধরে বঁধু প্রিয়ার হিয়ার মধু
পিও প্রিয় পিও।

প্রথম পিওটা ছাপা হয়েছিল 'পিত্ত'। অধ্যাপক ললিতকুমার আমাকে লিখেছিলেন—"তোমার কবিতায় 'হিয়ার' স্থলে 'যকৃৎ' হওয়া উচিত ছিল কিংবা পিত্তের স্থলে রক্ত হলে ভালো হ'ত। পড়ে আমার পিত্ত জ্বলে গেল।" নিজের দুর্বুদ্ধির জন্যও অনেক সময় বিপন্ন হয়েছি। কবির লৌকিক সত্তা ও অলৌকিক সত্তার সম্বন্ধে আলোচনায় দ্বৈরাত্ম্য (দ্বিরাত্মকতা) শব্দ ব্যবহার করেছিলাম—ছাপা হলো 'কবিগুরুর কাব্যে দৌরাত্ম্য'। এটা বোধহয় সংশোধকের লেখনীস্পর্শ লাভ করেছে।

পাঠ্যপুস্তকে লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গের যোগে দৃষ্টান্তের নিদর্শনে 'ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো'—এই বাক্যাঙ্গটিও ব্যবহার করেছিলাম—ছাপা হয়েছিল—বৌকে মেরে ঝিকে শিখানো। একজন শিক্ষক ভুলটা আমাকে দেখিয়ে দেন। কিন্তু এটা কি সত্যই ভুল? সেকালের হিসাবে ভুল নিশ্চয়ই নয়, একালের হিসাবে অবশ্য ভুল। সেকালে বৌ-ই বেশি মার খেত নাকি? শিক্ষাটা এই—'পুঁটি,—সাবধান, তুইও শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শাশুড়ীর কাছে এমনি মার খাবি।'

বাক্যে দুটি শব্দের স্থান পরিবর্তন আমারই আর একখানি বইএ হয়েছিল। লিখেছিলাম—'ফুল থেকে যেমন ফলের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ এদেশে পদ্য থেকেই গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে।' ছাপা হয়েছিল —'ফল থেকে ফুলের সৃষ্টি।' পড়াতে গিয়ে ভুল চোখে পড়ল—ছেলেরাও ভুল ধরিয়ে দিল। একজন বলে উঠল—ফল থেকেও ফুলের সৃষ্টি হয় স্যার, যেমন—লাউ, কুমড়া, শসার। ছেলেটি আমাকে সমর্থন করলেও আমি বললাম—তা নয়; ঠিকই আছে—ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর। তা হতে গাছ—তারপর গাছে ফুটে ফুল। তেমনি পদ্য থেকে নানা স্তর পার হয়ে গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে—বুঝলে তো।

এতো গেল জ্ঞানপাপীর আত্মসমর্থন। এমন অনেক সরল বিশ্বাসী আছেন যাঁদের মুদ্রিত রূপ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই হয় না।

বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো

ভ্রান্ত মুদ্রণকে যথাযথ মনে করে তার সমর্থনের জন্য তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টার কথা অনেকবার শুনেছি।

'শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই জানেন—একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নানবাত্মা নিয়ে কি বিপদেই পড়েছিলেন, তিনি সংস্কৃত অব্যয় 'নন্নু' থেকে নানবের ব্যুৎপত্তির সন্ধান করেও পাঠনাকক্ষে সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। বলা বাহুল্য—শব্দটা মানবাত্মার মুদ্রণপ্রমাদ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে।—লিখি সরস কিংবা সরল—ছাপা হয় সবল, অনৃত হয় অমৃত। ভাস্বর হয় ভাস্কর, রসাভাস হয় রসাভাব, পরিচ্ছিন্ন হয় পরিচ্ছন্ন, যুধ্যমান হয় যুদ্ধমান, ফারসী হয় ফরাসী, খট্বা হয় খট্টা, পক্ব হয় পক্ক, মন্দ্র হয় মন্ত্র, ষড়্‌যন্ত্র হয় ষড়যন্ত্র, স্বত্ব হয় সত্ত্ব। মনে হয় এরূপ ছাপার ভুলে আখরিয়ার সঙ্গে সংশোধকের ষড়্‌যন্ত্র (ষড়্‌) আছে। গ্রস্ত, সৌষ্ঠব, ঘনিষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, অন্ত্যেষ্টি, মুখস্থ, মূর্ধন্য, বিকিরণ, উদ্‌গিরণ, অদ্ভুত, ত্রিভুজ ইত্যাদি শব্দের বানানে মুদ্রকের উপরই নির্ভর করতে হয়। দুরবস্থা, দুরদৃষ্ট, গড্ডলিকা, জাত্যভিমান, ব্যত্যয়, ব্যয়, শুদ্ধ্যশুদ্ধি, ভূম্যধিকারী, অমাবস্যা, অজগর ইত্যাদি শব্দে একটি করে আ-কারের আবির্ভাব হবেই।

পৌরোহিত্য, ভৌগোলিক, অপোগণ্ড, গোলোক ইত্যাদি শব্দের ও-কার উবে যাবেই। ঔষধে একটা অনাবশ্যক ই-কার আসে। প্রজ্বলিত ও জাজ্বল্যমানে একটি করে বাড়তি জ-এর আবির্ভাব হয়।

যেসব ভুলের জন্য নানা নিবন্ধে ও পাঠ্যপুস্তকে এত কাল চেঁচামেচি করেছি, সেই সব ভুলই পাঠকরা আমার লেখায় পাবেন। কবিতায় আমি অনেক অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করি—তার ফলে এক-একটি ছাপার ভুলের শূলের আঘাতে কবিতা আধমরা হয়ে যায়। প্রেসের অধীন হলেই নিরুপায় ও অসহায় হতে হয়। নিজের কথাই দশ কাহন হয়ে গেল, এইবার একটু পরচর্চা করি—

রাজমন্ত্রীরা রাজমিস্ত্রীও বটেন—কারণ তাঁরাই তো রাষ্ট্রের ইমারত গড়ে তুলছেন। —তাই বলে দিলীপকুমারের দিদিমা তাঁকে বলেননি বা লেখেননি—ঐ তো রয়েছে অমুক রাজমিস্ত্রীর মেয়ে, ডানাকাটা

পরী···তাকে বিয়ে কর না কেন?' তিনি নিশ্চয়ই রাজমন্ত্রীই বলেছিলেন—দিলীপের স্মৃতিকথায় কিন্তু রাজমিস্ত্রী ছাপা হয়েছিল। দিলীপই রাজমিস্ত্রীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শুনেছি আচার্য জগদীশচন্দ্রের লেখায় পরশ্রীকাতর স্থলে পবস্ত্রীকাতর ছাপা হয়েছিল, তাতে তিনি খুবই বিচলিত হয়েছিলেন।

এক কবিতায় পেয়েছিলাম—শম্ভু-নিশম্ভু দৈত্যের কথা। শুম্ভের স্থলে শম্ভু ছাপা হওয়ায় কবিতার সর্বনাশ হয়ে গেল। তা সম্পাদক মহাশয়কে জানালে তিনি উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন, ওটা ছাপার ভুল। মহাদেবীর বধ্য হলো শুম্ভ—আর বন্দ্য হলো শম্ভু। শুম্ভ শম্ভু হয়ে গেল—লেখক সম্পাদক দুজনই নির্বিকার। ছাপার ভুলকে এদেশে কেউ অঙ্গহানি মনে করে না। "ভারতেব জয়গান গেয়ে হও আণ্ডামান।" পড়ে মনে হল—কবি বলছেন, ভারতের জয়গান গেয়ে আণ্ডামানে নির্বাসন যদি বরণ করতে হয়—তাও কর। ইংবাজ রাজত্বের সময়কার কথা ব'লে অসঙ্গত মনে হলো না। কিন্তু 'হও' কেন? ভেবে দেখলাম, নিশ্চয় আগুয়ান—আণ্ডামান হয়েছে।

এক জায়গায় পড়লাম—শিশুগণ আঙিনায় করে কলেবর। বলা বাহুল্য, কলরবই নব কলেবর লাভ করেছে।

অনেক লেখায় ছাপার ভুলে উল্টা অর্থ হয়েছে; অঙ্গীকার—ছাপা হয়েছে অস্বীকার, পরমতাসহিষ্ণু—পরমতসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। আকাংক্ষিত অকাংক্ষিত ছাপা হয়েছে, পঞ্জিকা গঞ্জিকার রূপ নিয়েছে। অনেক বাক্যে 'না' পড়ে গিয়ে উল্টা অর্থ হয়েছে।

পাঠপুস্তকে ছাপার ভুল থাকলেও সে-ভুলে যদি একটি শব্দের স্থানে আর একটি অর্থযুক্ত শব্দের আবির্ভাব হয়, তা হলে অনর্থ ঘটে। কারণ, শিক্ষকরা ও ব্যাখ্যাতারা ছাপার ভুল ধরতে না পেরে প্রাণপণ চেষ্টায় তার একটা অর্থ বার করতে চান। বলা বাহুল্য, তাঁরা ধরেই নেন, লেখকের বক্তব্য যথাযথভাবেই মুদ্রিত হয়েছে। আমারই লেখা কিছু অংশের ব্যাখ্যা থেকে দৃষ্টান্ত দিই।

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা।
নয়ননীরে 'বাজায়' ব্যথা পাথার ভানুনন্দনার।

এই অংশের আলঙ্কারিকতা বিচার করতে গিয়ে একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক বড় সমস্যায় পড়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—'এখন সমস্যা 'বাজায়' শব্দটি নিয়ে। বাজায় কে? গোপললনা নিশ্চয়ই নয়। কারণ দীনার পরে ছেদ রয়েছে। তাহলে পাথার নীরকে বাজায় অথবা নীর পাথারকে বাজায়—শেষোক্তটিই সঙ্গত মনে করি।'

কথাটা হচ্ছে 'বাড়ায়' (নেত্রাম্বুভি র্বর্ধতে), বাজায় 'ছাপার' ভুল। যাই হোক, আমার ভ্রান্ত (?) প্রয়োগকেও সমর্থনের উদ্দেশ্যে অধ্যাপকের ব্যাকুল প্রয়াসের জন্য আমি তাঁব কাছে কৃতজ্ঞ।

গালাগালি দেওয়াব ছিদ্র যাঁরা খোঁজেন,—তাঁরা ছাপার ভুল বুঝতে পেরেও অপপ্রয়োগ ধরে নিয়ে একটা শব্দ নিয়ে দশ লাইন কটূক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি করেন। এজন্য আমাকে কম ভুগতে হয়নি। পুবাতন 'সাহিত্য' পত্রিকা খুঁজলে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে।

দীনবন্ধু মিত্রের সুবধুনী কাব্য থেকে পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত ছিল—

"হের মাতঃ গোলদীঘি বড় রক্ত জোর।
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারেব গোর।"

'রক্ত' কথাটি নিয়ে শিক্ষকরা বড় বিপদে পড়েছিলেন। কথাটা 'রক্ত' নয়, বক্ত (বখ্ত), ফাবসী শব্দ, অর্থ—সৌভাগ্য। একজন বোধিকাকার সুসঙ্গত অর্থ উদ্ধার করতে না পেবে শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি সুরধুনী কাব্য খুলে আসল পাঠ দেখালেন।

পাঠ্যপুস্তকে বিভূতিভূষণের অপুর পাঠশালা সংকলিত ছিল। তাতে ছিল দা-কাটা তামাকের গন্ধের সঙ্গে 'লতাপাতার' গন্ধের মিশ্রণের কথা। বহু দিন ধরে ভুল ছাপা চলছিল। 'লতা-পাতা', —তালপাতা হবে। মেজের উপরে পাতা পাঠশালার ছেলেদের তালপাতার চাটাই-এর গন্ধ।

প্রভাতবাবুর আদরিণী গল্পে 'শ্লেষের' বদলে ভুল ছাপা 'স্নেহ'ও অনেকদিন পাঠ্যপুস্তকে চলেছিল। এই সব ভুল ছাপায় অর্থযুক্ত শব্দের আবির্ভাবই শিক্ষকদের মুশকিলে ফেলেছিল। উপাধির বেলায় নিরর্থক শব্দ এলে ততটা দোষ হয় না—কিন্তু সোমের স্থলে ডোম, ঘটকের স্থলে ঘোটক, বাগলের স্থলে পাগল, ঘোষের জায়গায় মোষ ছাপা হলে ক্ষমা করা যায় না। মমালয়ে পদার্পণ ছাপতে গিয়ে যদি যমালয়ে ছাপা হয় নিমন্ত্রণপত্রে, তবে বড়ই শোচনীয় ব্যাপার ঘটে।

ভুল ছাপার জন্য আখরিয়া ও সংশোধকই সব সময়ে দায়ী নন—লেখকও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। লেখকের লেখায় কোন শব্দ যদি অস্পষ্ট হয়, তবে তা আখরিয়া ও সংশোধক দুয়ের কাছেই দুর্বোধ্য হতে পারে। আর সংশোধক কেবল যদি শব্দের অর্থ টাই দেখেন এবং আগন্তুক শব্দের সঙ্গে বাক্যের সঙ্গতি আছে কি না তা না দেখেন, তবে ছাপার ভুল হবেই। প্রশ্নকর্তার দোষ-ত্রুটি যেমন মডারেটার সংশোধন করবেন আশা করা যায়,—আখরিয়ার এমন কি, লেখকের ভুলচুক, তেমনি আশা করা যায়, প্রুফ-সংশোধক সংশোধন করবেন।

আখরিয়ার অনেক ভুল হয় অক্ষর-বণ্টকের দোষে। ছাপার কাজ শেষ হওয়ার পর কেসের খোপে খোপে অক্ষর-বণ্টক অক্ষরগুলিকে রাখে—সে যদি ক্রমাগত ভুল ঘরে অক্ষর ফেলতে থাকে, তা হলে খোপ থেকে আখরিয়াও ভুল অক্ষরই তুলতে বাধ্য হবে। দুঃখের বিষয় অপটু শিক্ষানবিশদেরই বণ্টনের কাজ দেওয়া হয়।

বাংলায় কতকগুলি যুক্ত ও অযুক্ত অক্ষরের আকার সাম্য থাকায় ছাপার ভুল হয় খুব বেশি। যেমন এ—ত্র, ও—ত্ত, ঋ—ঝ, ক্ষ—ক্ষ্ম, প্ত—ত্ত, স্ত—প্ত, স্ক—ষ্ক, ষ্ট—ষ্ঠ, ব্দ—ব্ধ, থ—খ, দু—ছ, ক—ফ, ব—র, ড—ড়, ম্ন—ম্ম, স্প—স্প, গু—ণ্ড, খ—থ, ক্র—ত্রু, ঢ—ঢ়, চ—ঢ—এইরূপ আকৃতিসাম্যের জন্য লণ্ডভণ্ড—লগুভগু, পরম্পরা—পরস্পরা, সম্মান—সন্মান, শত্রু—শক্র এইরূপ ভুলের সৃষ্টি হয়।

বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে ইংরাজি উদ্ধৃতি বা সংস্কৃত উদ্ধৃতি থাকলে

প্রায়ই ভুল ছাপা হয়। ইংরাজি উদ্ধৃতিতে লেখকের ভুল নাও হতে পারে—তবে লেখক যদি স্মৃতি থেকে উদ্ধরণ করেন তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। ইংরাজি বানানের ভুলের জন্য মুদ্রণবিভাগই সাধারণতঃ দায়ী। অমল হোম ভায়ার হাতের লেখা খুবই সুন্দর ও সুস্পষ্ট, তবু তাঁর লেখা Chandidas শব্দটি ইংরাজিতে Chaulidas ছাপা হয়েছিল। এর জন্য সম্পাদক ত্রুটিস্বীকার করেছিলেন।

আর সংস্কৃতের বেলায় লেখকের দোষই বেশি। লেখক যদি অভ্রান্তভাবে মুদ্রিত সংস্কৃত বই খুলে দেখে দেখে সংস্কৃত শ্লোকের প্রত্যেক বর্ণটি সুস্পষ্টভাবে না লিখে স্মৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তাহলে ভুল হবেই। সংস্কৃতেব বেলায় প্রুফসংশোধকের পক্ষে লেখকের কাপির লেখাটির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। সংস্কৃতজ্ঞ সংশোধক তুর্লভ। একটি মাসিকপত্রে একটি স্রগ্ধরা ছন্দের শ্লোকে আমি ১৩টি ছাপার ভুল পেয়েছিলাম। সব ভুলই মুদ্রাকরের নিশ্চয়ই নয়। সুস্পষ্ট করে লেখেন না বলে বড় বড় পণ্ডিতদের উদ্ধৃত শ্লোকেও ছাপার ভুল পাওয়া যায়। সংস্কৃত একেবারে না জেনে কানে শোনা বা মনে পড়া সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ তোলেন অনেকেই। কাজেই কাপিতেই ভুল থাকে। পরে তার সংশোধনের উপায় থাকে না।

আখরিয়ারা লেখকদের স্কেপগোট। অনেক সময় যে কোন ভুলের জন্য লেখককে চেপে ধরলে লেখক বলেন, ও ছাপার ভুল। আমাদের দেশে ছাপার ভুল এত সুলভ যে, অনায়াসে আখরিয়া বা সংশোধকের ঘাড়ে সব ত্রুটি চাপানো চলে।

বাজার

শেষ পর্যন্ত নিজেই প্রত্যহ বাজার করব ঠিক করলাম। মাছ, তরকারীর দাম এত চড়া যে অন্যের উপর নির্ভর করা চলে না। মনোমত বাজার না হলে ভোজনটাও মনের মত হয় না। ভোজনের ওজনের ঘাটতির জন্য দেহের ওজনটাও কমে যাচ্ছে। ভোরে উঠতে পারি না কাজেই পাড়ার অধ্যাপকদের সঙ্গে উষাচর হতে পারি না। বাজার গেলে যাই হোক খানিকটা বাধ্যতামূলক প্রাতর্ভ্রমণ হয়। বাজার গেলে বাজার-ভাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। চড়া দরের বাজারে তাঁরাও কম দরের মানুষ ন'ন। তাঁদের মধ্যে আছেন—অনেক উচ্চপদস্থ (অধুনা অপদস্থ) সরকারী কর্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, ষ্টেথস্‌কোপে বেষ্টিত-গ্রীব ডাক্তার, ধুতি-বেনিয়ান পরা উকিল, হাফ প্যান্ট পরা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। তাছাড়া আছেন সম্ভ্রান্ত ঘরের বাজার-বোনরা, একাকিনী কিংবা মাসীর কিংবা দাসীর সঙ্গে। অতএব বাজার করায় কোন লজ্জার কারণ নেই। কোন সজ্জারও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এ কাজে বেশ বাধা পড়তে লাগল। প্রথম বাধা হলো—দেখা গেল খরচ বেশী পড়ছে। দরকষাকষি চলে না—যে দাম বলে তাতেই কিনতে হয়। যারা মাথায় বড় বড় বোঝা বয়ে সহরের আশপাশ অঞ্চল থেকে শাকতরকারী বেচতে আসে—তারা বড়ই গরীব। দু'চার পয়সা নিয়ে তাদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে দুঃখও হয়—লজ্জাও হয়। মনে হয় স্বভাবটা উঞ্ছ প্রকৃতির হয়ে পড়ছে—নজরটা দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। যারা সারাদিনের দোকান পেতে বসে আছে তারা তত গরীব নয় বটে, কিন্তু তাদের আনাজগুলি শিশিরসিক্ত নয়, কলের জলে সদ্য অভিষিক্ত।

যে কবি হাট করতেন না, হাটে-হাটে ঘুরে বেড়াতেন তিনি লিখেছেন—

শিশিরবিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা॥

এইরূপ ফলের নীরব ব্যথায় ব্যথিত করে তাঁর এই বন্ধুকেও।

হরিনামের ঝোলার মতো ছোট ছোট ঝুলি নিয়ে যারা বাজার করতে আসে, তাদের দেখেও দুঃখ হয়।

তা ছাড়া, মান-অপমানের কথা আছে—যদিও তাতে রাগের চেয়ে হাসিই পেয়েছে বেশি। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিই—

পটোল উঠেছে, কিন্তু দাম নিষেধের তর্জনী উঠিয়ে রেখেছে। নিত্যি একবার করে স্থায়ী ভিত্তির দোকানীকে জিজ্ঞাসা করি—পটোলের সের কত? একদিন জবাব পেলাম—কিনবেন না, মিছিমিছি দাম জিজ্ঞেস করে কেন বিরক্ত করেন? পটোল আপনাদের জন্য আনিনে, খাইয়ে লোকদের জন্য আনি। মান বাঁচাবার জন্য বললাম, 'দাও আজ কিনব।' দোকানী একপোয়া ওজন করছিল—বললাম, না, একসেরই দাও। দোকানী তাই দিল, কিন্তু হাসল। আর কোন দিন তার দোকানে কিছু কিনিনি। সেদিন মাছটা একবারে বাদ দিলাম। ঘরে ফিরে দাম কম করে বলেও তিরস্কৃত হ'লাম। আমি যে বরাবর বলেছি পাঁচসিকে সের পটোল কেনা ক্রিমিন্যাল।

আর একদিন অন্য একটা দোকানে একপোয়া ঝিঙে নিয়েছিলাম—দাম দিতে গেলে দোকানী বললে—আধ সেরের দাম চার আনা। আমি বললাম—না, আমি একপোয়া নিয়েছি। দোকানী ঝোলাটা টেনে নিয়ে ঝিঙে ঢেলে আবার ওজন করে বললে—নাঃ, ভুল হয়েছে আমার। কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জিত হ'ল না। ফলে, সে-দোকানটিও হাতছাড়া হয়ে গেল।

আর একটা দোকানের কথা বলি—কুমড়োর ফালি হাতে করে দেখলাম—তার প্রস্থ এক আঙ্গুলের বেশী নয়। সেটা হাত থেকে তার দোকানে ফেলে রেখে চলে আসছিলাম, সে বললে—অমন করে ফেলে দিলেন, আমার টমেটোগুলো নষ্ট হ'ল, আমার হাতে দিলেই তো পারতেন। আমি বললাম—'যতগুলো টমেটো নষ্ট হয়েছে সব ওজন করে দাও আমাকে।' দেখা গেল—একটাও নষ্ট হয়নি। তখন সে বললে—নষ্ট হতে তো পারত টমেটোর ওপর পড়লে। এ দোকানটিও হলো হাতছাড়া।

দিনকাল বদলে গেছে—সব শ্রেণীর উৎপাদকই উৎপাতক ও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। শ্রমের দামও বেড়েছে—যত নিম্নশ্রেণীর শ্রম—তত উচ্চশ্রেণীর মেজাজ। সকাল বেলায় ঝাঁটা হাতে করে জমাদার এসে দুয়ারে সশব্দে ধাক্কা মেরে যখন ধমক দিয়ে কথা বলে—তখন বেশ কৌতুক অনুভব করি। আমরা যখন বিনীত বচনে অসহায় অনুগতের অভিনয় করি, তখন নিশ্চয়ই সে-ও কৌতুক অনুভব করে।

তারপর একটা দোকান বাছলাম—তার পশারী প্রত্যহ যুগান্তর কিনে পড়ে। ভাবলাম নিজের পরিচয় দিই একে—তাহলে সে মান রেখে কথা বলবে। পরিচয় দিতে হলো না—তার দোকানে পেঁপে কিনতে গেলে সে নমস্কার ক'রে বলল, 'আসুন স্যার। আপনাকে আমি চিনি। দয়া করে আমার কাছে কিছুই তো কেনেন না।' আমি বললাম—আজ থেকে তোমার দোকানেই সব কিনব।

ইতিমধ্যে গৃহিণী তৌলদাঁড়ী, বাটখারা কিনে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, ওজনে কম হচ্ছে, ভোজনে তো দড়, কিন্তু বাজারে ওজনটা দেখছ না কেন? বাজার গিয়েও কবিতা ভাবো নাকি? কী যে ভাবি, তা আর বললাম না। কারণ, তখন দুজনেরই মেজাজ রসিকতার পক্ষে উপযোগী ছিল না।

আরো ছোটখাটো মানহানির সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধি হতে থাকল। যেমন,—জিনিস বেছে নিলে দোকানী বিরক্তি প্রকাশ করে—আমি

বলি—বেছে নিচ্ছি দাম বেশি দেব। দোকানী বলে—তা না হয় হলো, কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করছেন কেন? বেগুন পোকা-ধরা কিনা তার পরীক্ষা করলে পশারী বলে, 'বুঝলেন, বেগুন হচ্ছে সবচেয়ে নরম আনাজ—নরম জিনিসেই পোকা ধরে, পোকা এড়াতে চান তো শক্ত দেখে বেছে নিন।' আমি দেখলাম দোকানী বেশ জ্ঞানী লোক, ব্যক্তির সম্বন্ধেও তাই তো সত্য, জাতির সম্বন্ধেও তাই।

শাক জলে ভেজা বলে আপত্তি জানালে—পশারী বলে—শাকে জল থাকবে না তো বেলে জল থাকবে নাকি—ইচড়ে জল থাকবে নাকি? জল ছাড়া শাক জন্মায়ও না—তাজাও থাকে না, সিদ্ধও হয় না।

মেছুনী বলে, মরা মাছে একটু পচন ধরবেই, অত বিচার করতে গেলে কই, মাগুর কিনে নিয়ে গেলেই পারেন। সস্তাও খাবো, জ্যান্তও খাবো তুই-ই হয় না। মরা মাছ খেতে হলে একটু তেল খরচও করতে হয়। যদি বলা যায়, পাশের দোকানে তুই টাকা সের দিচ্ছে—আর তুমি আড়াই টাকা চাচ্ছ কেন? উত্তরে বলে—'যান, সস্তা খেয়ে পস্তাবেন। তফাৎ আছে—তা আপনি ধরতে পারবেন না।'

বাজার-ভাইদের সঙ্গে রসালাপের তু' একটা নমুনা—

একজন বাজার-ভাই এক পোয়া (চারটাকা সেরের) কাটামাছ ও আধসের পুঁটিমাছ কিনলেন। আমি বললাম—কি হে জামাই এসেছে নাকি? তুরকম মাছ কেন? তিনি হেসে বললেন—ঠিক ধরেছেন, দাদা। তিনি শুধালেন—আপনি ন্যাটা আর বেলেমাছ কিনছেন—ছেলেরা কি ও-মাছ খাবে? আমার উত্তর—তারা জানবে কি করে? ওতে চপ তৈরি হয়ে তাদের পাতে আসবে যে। মেয়েরা কী মাছ তা জানতেই দেবে না। আর একদিন এক বাজার-ভাইকে শুধালাম—মাছ কিনলে না যে? উত্তর পেলাম—কালও কিনিনি, তুদিন মাছ না খেলেও চলবে। কাল রাত্রে বড় মেয়ের বাড়ীতে সবার নিমন্ত্রণ ছিল।

কচু ভালো সিদ্ধ হয়নি, পরদিন কচুর পশারীকে জানালে, সে বলে —কচু ভালো সিদ্ধ হচ্ছে না তা কি আমার দোষ? 'দেশের মাটির দোষ। কচু খেতে হলে কয়লা বেশী খরচ করতে হয়।' এইভাবে বাজারে গিয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করছি মানের বিনিময়ে।
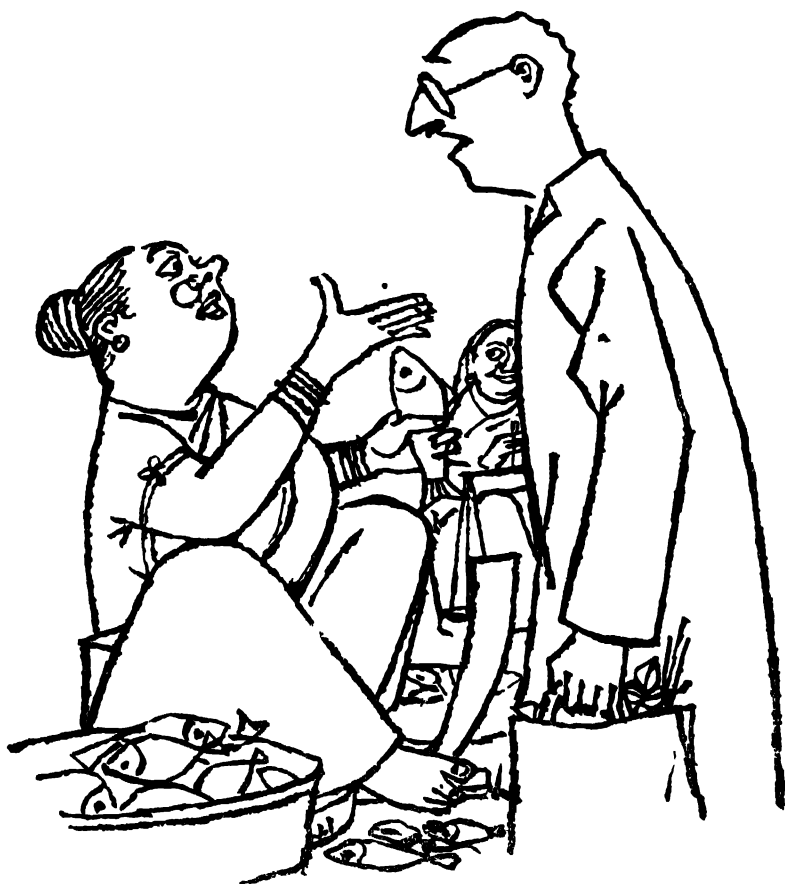
সস্তাও খাবো, জ্যান্তোও খাবো দুই-ই হয় না

বাড়ীতে আমার বাজার-করা জিনিসের যে সমালোচনা হয়, তার চেয়ে বাংলা ভাষার তরুণ অধ্যাপকদের বিরূপ সমালোচনা (আমার

কবিতার) ঢের সহনীয়। সমালোচনার নমুনা—বেগুন বীজে ভরা কিংবা পোকাধরা, কলার বীজগুলো পুঁতে দিলে বাড়ীতেই গাছ হবে কলা আর কিনতে হবে না। কুটকুটে বুনো ওল আনা হয়েছে কিন্তু বাঘা তেঁতুল আনা হয়নি ডাবে জল নেই, কিন্তু বাঁধা কপিতে যথেষ্ট জল আছে। লঙ্কাগুলো বেশ মিষ্টি, পায়েসেও চলতে পারে। কচু সিদ্ধ না হলেও যাদেব দাঁত আছে তাদের অসুবিধা হবে না। লাউ বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু কুমড়ো বেশ কচিই আছে। বেল দুটোর মধ্যে একটার ভিতরটা পচা বটে, কিন্তু আর একটার ভিতর বেশ কাঁচাই আছে—পুড়িয়ে খেলেই চলবে। লেবুতে রস কম বটে, কিন্তু জলে হাজা পটোলে বেশ বস আছে। ফুলকপিটা বেশি ফোটা ও ছোট হলেও ডাঁটা ও পাতাগুলি বেশ বড় বড়ই আছে। মূলো যে এ মাসে খেতে নেই তা আমবা মুক্ষু সুক্ষু হলেও জানি—আব বিদ্বান হয়েও এঁদের জানা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি—

বাজারের হিসাব দিতে প্রাণান্ত, দাম কম করে বলে কত আর মিথ্যা কথা চালানো যায়? শেষ পর্যন্ত কাগজ কলম নিয়ে টি-এ বিলের মতো একটা হিসাব তৈরী করতে হয়।

বাড়ীতে যে সব উপদেশ পাই সেগুলো মনে থাকে না—ফলে পরীক্ষায় ফেল করে ৪৫ বৎসরের পরীক্ষকত্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কতকগুলি উপদেশ এই—

১। মোচার একটা ফুল ভেঙে মুখে দিয়ে দেখতে হয় তিঁত কি মিষ্টি।

২। মূলোর গায়ে নখ ফুটিয়ে দেখতে হয় কচি কিনা—মূলো বড় হলেই ভালো হয় না।

৩। ঢেঁড়সের ডগা দুম্‌ড়ে যদি দেখা যায়, ভাঙ্‌চে তবু মচকাচ্ছে না, তা হলেই তা ক্রয়যোগ্য ব'লে বুঝতে হবে।

৪। ইঁচড় ফালিতে দেখতে হয় তার কতটা পাকশালার—আর কতটা গোশালার উপযুক্ত।

৫। বেগুনের মাথার টুপি খুলে দেখতে হয় তার তলায় পোকার ছেঁদা আছে কিনা।

৬। লাউ-ফালিতে দেখতে হবে বীচিগুলো নরম কিনা।

৭। মাছের কানকোর ঢাকনি তুলে দেখতে হবে তা আসল রক্তে রাঙা না লাল রঙে রাঙানো ইত্যাদি—

মাছ তরকারী কম আনলেও মুস্কিল, বেশি আনলেও মুস্কিল—অর্থাৎ আগালেও ভেড়ের ভেড়ে—পিছুলেও ভেড়ের ভেড়ে।

উল্লিখিত নানা কারণে বাজারবিমুখতা জন্মাতে লাগল, তারপর একটা ঘটনায় বাজারসচেতনতা একবারে খতম হয়ে গেল।

আমারি মতন একজন ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ বাজারভাই—আলুর বেদিকার সামনে দাঁড়িয়ে এক একটি ক'রে আলু বাছত—সে যেগুলোয কোন খুঁত পেত, সেগুলো খুঁতো আলুর ঝুড়িতে ফেলে দিত—আর সর্বাঙ্গসুন্দর আলুগুলিকে ছোট চুপড়িতে রাখত নিজের জন্য। এই কাজটি সে করত বহুক্ষণ ধরে। মাসটা অবশ্য আলু বাছার মাসই বটে—কারণ এটা ঠিক পূজার আগে। আমি একদিন বল্‌লাম—আপনি এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলু বাছছেন কেন? নেবেন তো পাঁচপোয়া আলু। তিনি উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন "আরে মশায়, পচা আলু খেলে কলেরা হয় জানেন? পচা আলু কেউ না কেনে সেজন্য বেছে বেছে ঐখানে পৃথক করে রাখছি, খুব ভাল ক'টি আমি নিজে নেব।"

পূজার ছুটিতে কিছুদিনের জন্য দেওঘর গিয়েছিলাম—দিন পনেরো-কুড়ি পরে বাজারে এসে আলবিক দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সেই আলু পরীক্ষক বৃদ্ধকে দেখছি না আজ! সে জবাব দিল—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজার আগেই কলেরায় মারা গেছেন।

আমি বললাম—বল কি? কলেরায়? যে কলেরার ভয়ে তিনি আলু বাছতেন? তোমার খুঁতো আলুব ঝুড়ি দেখছি না তো।

আলুওয়ালা একটু হেসে অম্লান বদনে বল্‌লে—বৃদ্ধের জামাই

তাঁর'শ্রাদ্ধের জন্য এক বস্তা আলু কিনতে এসেছিল—ঝুড়িভরা খুঁতো আলুগুলোকে সেই বস্তায় মিশিয়ে চালিয়ে দিয়েছি। বাকি সিঙাড়া তৈবির জন্য রবীন্দ্র-মিষ্টান্ন-মন্দিরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম—কাজটা হয়ত ভালো হ'ল না। খোঁজ নিয়েছি শ্রাদ্ধেব নিমন্ত্রণ খেয়ে অথবা পাড়ার কারো কলেরা হয়নি।

এরপর আমার বাজারবিমুখতা বাজার-বিভীষিকায় পরিণত হ'ল। আর বাজারে যাই না। আমার বাজার আনন্দবাজার নয়, নিবানন্দ বাজার। তাই লেখাটা আনন্দবাজাবে না পাঠিয়ে যুগান্তরেই পাঠালাম।

মুড়ি

শিশুকালে দাঁত উঠবার পর মুড়ি চিবাতে সুরু করেছিলাম—আর আজ বহুকাল পরে সেই মুড়িই চিবাচ্ছি বাঁধা দাঁতে। শৈশবে যখন হামাগুড়ি দিতাম—তখন মেজেয় ছড়ানো মুড়ি খুঁটে খুঁটে খেতাম। আর এই দ্বিতীয় শৈশবে হাত থেকে মুড়ি দুচারটা টেবিলে পড়ে গেলে তাও খুঁটে খাচ্ছি। মুড়ি দিয়েই সুরু,—মুড়ি দিয়েই সারা হতে চলেছে জীবনের লীলা।

এগারো বছর বয়স পর্যন্ত রাঢ় দেশের গ্রামে অর্থাৎ স্বগ্রামে ছিলাম—এই কয় বছরই মুড়ির সঙ্গে মাঢ়ির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তারপর ৫০ বৎসর মুড়ির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়—আবার গত নয়-দশ বছর মুড়ি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমি বুড়ো হয়েছি—মুড়ি কিন্তু বুড়ী হয়নি। বরং আমার চোখে মুড়ির স্বাস্থ্যশ্রী, লাবণ্য ও মাধুর্য ঢের বেড়েছে; তার সমাদরও তদনুরূপ হচ্ছে। এতদিন প্রবাদেই শুনেছিলাম, মুড়ি মিছরির সমান দর ছিল বুঝি কোন এক আজব মুলুকে। এতদিনে তা সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হ'ল নিজেদেরই রাজ্যে। এখন আর ঐ কথা নিয়ে পরিহাস করা চলবে না। এত গেল বাচ্যার্থের কথা, লক্ষ্যার্থেও সব ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কারণ, এখন হুজুরেরও এক ভোট মজুরেরও তাই। আমীরের মতের দামও যা ফকিরের মতের দামও তাই। জমাদারের পিছুতে দাঁড়াতে হয় জমিদারকে কাউন্টারে ও ভোটের বুথে।

আমাদের গ্রাম্যজীবনে বৈকালে কিছু খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না—রীতি ছিল সকালেই কিছু খাওয়ার। সেই কিছু হচ্ছে মুড়ি। ছোট ছোট মেয়েদের 'টুকুই' ভরে মুড়ি দেওয়া হত। আমাদের দেওয়া হ'ত কোঁচড় ভরে। তখন তো হাফ প্যান্ট পরার প্রথা ছিল না।

কোঁচড়ভরা মুড়ির সঙ্গে দেওয়া হ'ত সার গুড় কিংবা আখের গুড়ের পাটালি ও ছোলা ভাজা।

এই মুড়ি চিবানো একটা শাস্তি ছিল। অর্ধেক পরিমাণ শেষ করার পর, গুড় পাটালি ফুরিয়ে গেলে—তখন মুড়ি ছড়িয়ে কাক জড়ো করা একটা আমোদ ছিল। আর একটা আমোদ ছিল—ডোবার ঘাটে বসে জলে মুঠি মুঠি মুড়ি ছড়িয়ে পুঁটি মাছদের ডেকে রোজ তাদের ভোজ দেখা। মুড়ি কড়াই ছুঁড়ে লড়াইও চলত ছেলেয় ছেলেয়। মোট কথা মুড়ি চিবোতে শেষ পর্যন্ত ভালো লাগত না।

সকাল বেলার পাঠশালায়, পরে গ্রীষ্মকালে সকালে ইস্কুল বসলে এই মুড়ি নেকড়ায় (রুমালে নয়, রুমালের একটা কৌলীন্য আছে) বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো। ঘণ্টাখানেক পরে তাই আমরা খেতাম আর সেলেটে অঙ্ক কষতাম। ইস্কুলে কোরাসে মুড়ি চর্বণটা নেহাৎ মন্দ লাগত না।

প্রবীণ লোকেরা মুড়ি খেতেন একটু দেরিতে সাধারণতঃ স্নানের পরে। শুকনো মুড়িকে উপাদেয় করে তুলবার অর্থাৎ হেয়কে প্রেয় ও শ্রেয় বানাবার জন্য তাদের কতই না আয়োজনের প্রয়োজন হ'ত। স্বাদু করবার অনুপান ছিল এইগুলি—তৈল, লঙ্কা, আদা, বরবটী ছেঁচকি, নারিকেল, মটর ভাজা, ছোলা ভিজে, কাঁটালের বীচি ভাজা, শসা। তাছাড়া—গুড়-পাটালি, বাতাসা ইত্যাদি। পেঁয়াজ নামক বস্তুর ভোজন তখনও রেওয়াজ বা দস্তুর হয়নি। চীনাবাদামের খবর তখন গ্রামের লোক জানতই না। আমাদের ভাগ্যে এ-সব আদৌ জুটতই না। এসব দিয়েও মুড়ির স্তূপ সাবাড় করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত গুড়সংযোগে জলে ভিজিয়ে তাঁরা প্রাতরাশপর্ব সমাপ্ত করতেন। ধান কাটার সময় মুসুরি সিদ্ধ দিয়ে মুড়ি, মুড়ির লাড়ু আর আখ পীড়ানোর সময় আখের রসে মুড়ি ভিজিয়ে খেতে পেতাম। আমাদের কাছে এই ছিল জলযোগে মুড়ির রাজসিক বিনিয়োগ। বিধবারা দু'বার মুড়ি খেতেন, একবার বেলা ১০টা-১১টায়, আর

একবার রাত্রে। দন্তহীনা বুড়ী বিধবারা মুড়িকে গুঁড়ি করে নিয়ে খেতেন।

এক একজন মুনিষ যে পরিমাণ মুড়ি নিয়ে যেতো প্রাতরাশের জন্য—এখন আমাদের গোটা পরিবারের তাতে ৪।৫ দিন চলতে পারে। তাদের মুড়ি ভক্ষণের প্রধান অনুপান ছিল পেঁয়াজ। পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত তারা মাঠেই নানা অনুপান পেত।

গ্রামের ইস্কুলের পড়া শেষ করে যেদিন শহরে এলাম—সেদিন থেকে মুড়ির সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটে গেল। দেখলাম, শহরে সুসভ্য লোক ছাড়া সকাল বেলায় কেউ কিছু খায় না (তখন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে চা-পাঁউরুটি-বিসকুট-কেক খাওয়ার রেওয়াজ হয়নি) —সকলকেই বৈকালে কিছু খেতে হয়। বৈকালে শহরের লোকে ফল, ফুলুরি, হালুয়া, লুচি, পরোটা ইত্যাদি খায়। নিতান্ত গরীব যে সেও মুড়ি খায় না, বরং চিঁড়ে খায়। আর যারা আমাদের চেয়ে সঙ্গতিপন্ন তারা দোকান থেকে শিঙাড়া, কচুরি, নিমকি, জিলিপি, গজা, রসগোল্লা ইত্যাদি কিনে আনিয়ে খায়।

ইস্কুলে গিয়ে মুড়ির চেয়ে ঢের বেশি মুখরোচক চীনাবাদামের সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় হল। মা টিফিনের জন্য প্রত্যহ দুটি করে পয়সা দিতেন—এতে ৪ খানা কচুরি ও একটু হালুয়া (উপরি পাওনা) পাওয়া যেত,—কখনো কখনো তাই খেতাম। কিন্তু চীনাবাদাম বেশি মুখরোচক, ওতে অনেকক্ষণ ধরে দশনপেষণে রসনায় রসসৃষ্টি চলে ব'লে চীনাবাদামই টিফিনের খাবার হয়ে উঠল। সাবাড় না হতেই টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেলে তার কিছু পকেটেই থেকে যেত এবং বাড়ী পর্যন্ত মাঝে মাঝে আসত। কখনো কখনো চীনাবাদাম দিয়ে মুড়ি খাবার ইচ্ছা হত। কিন্তু খাবার উপায় ছিল না বাবার জন্য। বাবা বলতেন, "মুড়ি খেলে ছেলের পেটে পিলে হয়। ম্যালেরিয়ার অঞ্চলে মুড়ি খাওয়া ঠিক নয়, তা ছাড়া মুড়ি হলো ব্লটিং পেপার—মুড়ি শরীরের সব রস শুষে নেয়। সেজন্য

দেখনা আমাদের রাঢ় দেশের লোকগুলো কত শীর্ণকায়, মুড়ি নিজে সাদা হলেও বোধহয় খাদকের রঙ কালো ক'রে দেয়, সেজন্য রাঢ় অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ কালো।" আশ্চর্যের বিষয়, সাদা খই সম্বন্ধে তাঁর এ আপত্তি ছিল না। খইকে রোগীর পথ্য হিসাবে ধরা হ'ত। খই খাওয়া চলত অসুখ হলে, কিন্তু মুড়ি খাওয়ার আর উপায় ছিল না। মা তখন মুড়ির রূপান্তর ও বর্ণান্তর ঘটিয়ে অর্থাৎ মুড়ির নাড়ু করে লুকিয়ে খেতে দিতেন মাঝে মাঝে। খইয়ের মোয়ায় ক্ষীর দেওয়া হ'ত—ধানের সন্তান খই-এর সে কৌলীন্য ছিল। চালের সন্তান মুড়ি অকুলীন, ক্ষীর লাভের গৌরব সে পেতে পারে না। শুভ অনুষ্ঠানে খই ছড়ানোর বিধি আছে, কিন্তু মুড়ি ছড়ানো চলে না। তবে 'নাড়ু হয়ে উঠলে মুড়ির নাম বদলে যায়—তার নাম হয় মোয়া।

যাই হোক মুড়ি খাওয়া হয়নি বহু কাল ধ'রে। উত্তর বঙ্গে তো মুড়ি চোখেও দেখিনি। মুড়ি খাওযার অভ্যাস একেবারেই চলে গিয়েছিল। কলকাতায় একটানা একচল্লিশ বৎসব আছি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত মুড়ি আর খাওয়া হয়নি। তখনও ঘৃত পাওয়া যেত। মহাযুদ্ধে যারা মৃত—তাদেব মধ্যে ঘৃত একটি। ঘৃত জীব না হলেও জৈব পদার্থ। ঘৃত মরে স্বর্গে গিয়েছে।—ঘৃত এখন অমৃতের চেয়েও দুর্লভ। ঘৃত গেল, 'বৈল বাকি তৈল।' ঘৃতের অনুকল্প তৈলও অত্যন্ত দুর্মূল্য হয়ে পড়ল। তৈলেব ব্যবহারও সঙ্কুচিত হলো। ফুলুরি, পেঁয়াজী, বড়া, বেগুনি খাওয়াও বন্ধ হলো। তখন বৈকালে মুড়ির ডাক পড়ল। ঘৃতেব অনুকল্প অনেক রকম উপঘৃত অপঘৃত বার হয়েছে। কিন্তু সে সবতো অপরিচিত বস্তু। তার মধ্যে কি আছে কে জানে? তা ছাড়া ক্ষদেব জাউ দিয়ে দুধের তৃষ্ণা মেটানোর মতো ঘৃতের বদলে উপঘৃত ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হলো না। তার চেয়ে সুপরিচিত মুড়িকেই প্রশ্রয় দেওয়া ও আশ্রয় করা গেল।

যদিও মুড়ি আজ দুর্মূল্য তবু তাতে পেটে তলী পড়ে, তবু অনেকক্ষণ চিবানো তো চলে। দুই আনায় তবু কিছু খেলাম বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। আর কেউ না করুক প্রমথ বিশী ভায়া আমাকে এ বিষয়ে সমর্থন করবে। বহুদিন মিত্রঘোষের গ্রান্থিক গর্তে তার সঙ্গে আনন্দবাজারের পাতায় ঢালা মুড়ি ছোলাভাজা দিয়ে খেয়েছি।

দুর্মূল্য হলেই খাদ্যে ভেজাল চলে। মুড়িতেও তাই ভেজাল চলছে। বর্ষার বিকালে গলি দিয়ে ফিরছি দেখলাম—একজন বিধবা মুড়িওয়ালী মুড়ি ভাজছে, উনুনের ধারে মুড়ি জড়ো হয়ে আছে। দেখে লোভ হ'লো তক্ষনি দু'আনার একঠোঙা কিনে আনলাম পকেটে পুরে। বাড়ী এসে খেতে গিয়ে দেখি কতকগুলো বেশ তাজা, বাকিগুলো মিহানো। তাজার সংখ্যাই কম। সদ্য-ভাজা মুড়ি এমন কেন হ'লো? রহস্যময় ব্যাপার! তখন মনে পড়ল বাজারে মৌরলা মাছ কেনার কথা, মেছুনী তিন-চারটা মাছের কান্‌কো উলটিয়ে দেখালো—তাজাই বটে। বাড়ী এসে দেখলাম—অধিকাংশই পচা—মাঝে মাঝে দু-চারটে টাট্‌কা। রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে গরম মুড়ি পাঁচসিকে সের। গরম মুড়ি পরম সস্তা এ-যে। নেমে গিয়ে এক পোয়া মুড়ি চাইলাম। সস্তা মুড়ি একমুঠো বস্তা থেকে নিয়ে দেখি বেশ গরমই। ঘরে এসে তেল মাখিয়ে খেতে গিয়ে দেখি মিহানো, কি করে তা হলো? বুদ্ধিতে কুলালো না। মুখে দিয়ে দেখা হয়নি—হাতে ছুঁয়ে দেখা হয়েছে। এক ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধব্য বস্তুকে অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করলে এইরূপই হয়। আমার চেয়ে যিনি বুদ্ধিমতী, রহস্যটা তিনিই উদ্ঘাটন করে দিলেন।

মুড়ি ছিল জেলেপাড়ার মৎস্যগন্ধা, আজ সে রাণী সত্যবতী হয়েছে। এখন আর মুড়িকে অনাদর করা চলবে না। একদিন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে জামাই এলেও কলার সংযোগে ফলার করতে মুড়িগুড় দেওয়া হ'ত। এখন আবার গৃহে অভ্যাগত এলে

একবাটি তৈলমাখা চীনাবাদাম বা ডালমুট মিশানো মুড়ি লঙ্কা (পূর্ববঙ্গে হলে) বা নারিকেল কুচি (পশ্চিমবঙ্গে হলে) সহ অনায়াসে নিবেদন করা যেতে পারে। এতে লজ্জা করবার কিছু নেই। চায়ের সঙ্গে চমৎকার অবদংশ হতে পারে।

অভ্যাগতকে অনেকক্ষণ ধরে আতিথ্যে তর্পণ করা চলে। আমিতো অনায়াসে এই সুযোগে গোটা তিনেক কবিতা শোনাতে পারি। আচার্য

আমার চেয়ে যিনি বুদ্ধিমতী রহস্যটা তিনিই উদ্ঘাটন করে দিলেন

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ঋষিতুল্য মহাপুরুষ, বহুদিন আগেই তিনি এই খাদ্যকেই বাঙালীর আদর্শ উপাহার্য (উপ + আহার্য) বলে নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মুড়ির কাহিনীর পাতা মুড়িয়ে ফেলি।

জুতোচুরি

অবিনাশের বাসা আমার বাসা থেকে আধ মাইলের বেশিই হবে। খড়ম পায়ে দিয়ে সেদিন সকালবেলায় হন্তদন্ত হয়ে সে এসে হাজির। অবিনাশ আধ পাগলা মানুষ তা জানি, তবু জিজ্ঞাসা করলাম—একি আজ খড়ম পায়ে দিয়ে যে?

অবিনাশ—কেন দোষটা কি? গ্রাম দেশে তো আমরা খড়ম পায়ে দিয়েই সারা গাঁ ঘুরি।

আমি—কিন্তু এটা যে কলকাতা শহর!—

অবিনাশ—ঝাঁটা মারো তোমার জুতাচোর কলকাতার মাথায়।

আমি—এতদিন তো কলকাতা ঘটিচোর ছিল তোমাদের কাছে, এখন কি তার নাম বদল হ'লো? ব্যাপার কি?

অবিনাশ—এই তিনবার হলো। আর না। কাল কালীবাড়ী গিয়েছিলাম—যতদূর জুতো চলে ততদূর গিয়ে জুতো খুলে রেখে উঠানে বসে কালীনাম জপ করছিলাম—আর জুতোর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম, তারপর জপটা একটু জমে গেলে দু'মিনিট তাকাই নি—তারপর চোখ মেলে দেখি—জুতো নেই। কালীবাড়ীতে প্রতিজ্ঞা করলাম, জুতো আর কিনব না, দেখি বেটারা কি চুরি করে?

আমি—তা না হয় হলো! দূরে যেতে হলে কি করবে?

অবিনাম—সে হবে—একজোড়া ছেঁড়া চটি আছে। যা যা হারায় তা তা আর কিনছি না—এ আমাব Protest against bad Government.

আমি—তুমি যে এ সংকল্প করলে ভাই, এ সংকল্পই যদি সবাই করে, তুমি যদি এ নিয়ে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা কর, ভেবে দেখেছ—তবে দেশের দশা কি হবে? দেশের ইনডাস্ট্রির কি হবে? দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কি হবে?—কত লোক বেকার হয়ে যাবে, যাদের চুরিই জীবিকা তাদেরই বা কি গতি হবে?

অবিনাশ—আমার দেখবার দায় পড়েছে—দেখুক অকর্মণ্য সরকার। যে সরকার সামান্য এই জুতো চুরি বন্ধ করতে পারে না, সে সরকার লাখ লাখ টাকা চুরি বন্ধ করবে কি ক'রে? এই অকর্মণ্য সরকারকে আমি আর ভোট দেব না। আমার এই খড়মের এক একটা খট খট শব্দ সরকারের বিরুদ্ধে এক একটা ধিক্‌কার। খড়ম প্রচারই হবে এখন থেকে আমাব পরম ও চরম ব্রত।

আমি—তোমার দেখাদেখি সবাই খড়ম ধরলে শহর এমনি গরম হয়ে উঠবে যে, এর জন্য একটা কমিশন বসে যাবে। একটা হিল্লে হবেই, তুমি বোধ হয় এই আশা কর—

অবিনাশ—ইংরেজরা ছিল সত্যই রাজা হওয়ার যোগ্য। কারণ, তাদের গির্জাতেও জুতো খুলতে হয় না—জুতো খুলে তাদের খেতে হয় না। কই, ইংরাজ আমলে তো জুতো চুরি যায়নি। অমন ইংরাজকে তাড়িয়ে দেশটাকে জুতোচোরে ভরিয়ে তুলল এরা।

আমি—এক কাজ করো—একজন বিরুদ্ধ পার্টির এম-এল-এ-কে দিয়ে এসেম্বলিতে কথাটা তোলাও না কেন? তাতে একটা আন্দোলন চলতে পারে।

অবিনাশ—তবে শোন, বলেছিলাম আমাদেব পাড়ার বসন্তবাবুকে—তিনি তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। ভাবলাম—বসন্তবাবুর জুতো চুরি করতে হবে অর্থাৎ করাতে হবে, নইলে, এটা যে কত সিরিয়াস তা বুঝবেন না।

আমি—দেখ, কোন পুণ্যস্থানে গেলে একটা গরীব ছেলেমেয়েকে চারটে পয়সা কবুল ক'রে জুতোর ভার দিও—তারপর দেবার সময় দুটো কি একটা পয়সা দিলেই চলবে।

অবিনাশ—চমৎকার যুক্তি। সেইত জুতো নিয়ে পালাবে।

আমি—তা বটে! পুণ্যস্থানে অথবা ত্রিপুরারি ভাযার মহাভারত,

ত্রিপুরাশঙ্করের রামায়ণ কিংবা রাধাগোবিন্দ নাথ বাবাজীর ভাগবত পাঠ শুনতে গেলে খড়ম পায়ে দিয়েই যেও। আর নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গেলে হোষ্টকে বলবে,—জুতো হারালে জুতোর দাম দিতে হবে।

অবিনাশ—দামও দেবে না—উল্টে আমার নিমন্ত্রণই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি—তবে খেতে খেতে সন্দেশ কি চপ পকেটে পুরে আনার যদি অভ্যাস না থাকে তবে দুই পকেটে দু'পাটি জুতো নিয়ে খেতে বস্‌বে।

অবিনাশ—সন্দেশ-টন্দেশ পকেটে ফেলার সুযোগ হয় না—তবে গিন্নীর জন্য কয়েকটা পান পকেটে পুরে নিয়ে আসি বৈকি? তাছাড়া, নিজের জন্য ২।৩টা সিগারেট নিতে হয়। সে সুবিধে হবে না, লোকে দেখলে কি বলবে, বলত?

আমি—তবে এককাজ করো—নিমন্ত্রণবাড়ীতে গিয়ে আগে কোন গোপনীয় স্থানে জুতো রেখে দেবে—ডাকবা মাত্র জুতো রাখার জায়গা খুঁজতে গেলে ছাদে গিয়ে আর বসবার ঠাঁই পাবে না। তাছাড়া, আজকাল তো অনেক বাড়ীতে হাইবেঞ্চিতে খেতে দেয় সে ক্ষেত্রে জুতো ছাড়তে হবে না। তাতে অবশ্য আহারান্তে জুতো খুঁজে পাওয়ার আনন্দ হতে বঞ্চিত হতে হয়। এ আনন্দ আবিষ্কারের আনন্দেরই মতো। সে আনন্দের লোভটা সংবরণ করতে হবে।

অবিনাশ—যাক একটা সুযুক্তি পাওয়া গেল। এজন্যই তোমার কাছে আসা।

আমি—কিন্তু এতে দেশব্যাপী জুতা চুরির সমস্যার তো সমাধান হলো না।

অবিনাশ—তা না হ'লো তো বয়ে গেল। আমার জুতো চুরি না গেলেই হলো। দেশের সমস্যা দেশের কর্তারা বুঝুন গিয়ে। আমার কি মনে হয় জানো, পাদুকাশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষতঃ

জুতার চাহিদা বাড়ানোর জন্য সরকার একদল জুতাচোর ছেড়েছে। সরষের মধ্যেই ভূত।

আমি—ওঃ—তোমার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি খুবই প্রখর দেখছি—জুতো চুরি তোমাকে চিন্তাশীল পলিটিশিয়ান ক'রে তুলেছে। এমনি একটা-না-একটা ব্যক্তিগত ক্ষতিই তো সাধারণ নিরীহ মানুষকে প্রচণ্ড পলিটিশিয়ান ক'রে তোলে হে।

অবিনাশ—তবে বলছ জুতো কিনতে ?

আমি—মা-কালীর নামে শপথ করো নি তো ?

অবিনাশ—তা করিনি—তবে কালীবাড়ীতে শপথ করেছি।

আমি—তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি জপে বসে মাঝে মাঝে জুতোর পানে তাকাচ্ছিলে, সেই পাপে তোমার জুতো গিয়েছে। শোন আমার কথা বলি—আমি জুতো খুলে বুদ্ধগয়ার মন্দিরে ঢুকেছিলাম—ফিরে এসে দেখি একটি শীর্ণকায় মেয়ে আমার জুতো আগলে ব'সে আছে। সে হিন্দীতে বললো "বাবুজী আমার ভাই-এর বড় অসুখ—পয়সার অভাবে তাকে একটুও দাওয়াই দিতে পারি নি।" আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—টাকা ছাড়া কিছু নেই। কাজেই তাকে কিছুই দেওয়া হ'ল না। খানিক দূর গিয়ে একটা পান-সিগারেটের দোকান পেলাম। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে টাকা ভাঙ্গিয়ে তাকে একটা সিকি দেব ভেবে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি বালিকাটি নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে গেলাম। পরদিন কলকাতার ট্রেনে ফিরলাম। কামরায় জুতো খুলে বসে একটা বই পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে একটু ঘুম এলো। কোডরমা ষ্টেশনে মালপত্র নিয়ে একজন নেমে গেল। তার নামার পর আবিষ্কার করলাম—একপাট জুতো নেই। সারা কামরা খুঁজে সে পাটটা পেলাম না। বুঝলাম বালিকাকে বঞ্চিত করার অপরাধের দণ্ডস্বরূপ জুতো পাটিটা হারালাম। মালপত্রের টানাটানিতে একপাটি কোডরমার প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয়ই থেকে গেছে।

অবিনাশ—যাক—আপনি তবুত একপাট পেলেন। আমার যে দু'পাটই গেল, দাদা!

আমি—একপাটের দাম কী ভায়া? বাকি পাটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাঠের দিকে। হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে একজন গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে চীৎকার করে উঠল—"বাবু, আপনার হারানো পাটিটা ট্রেনের পাদানিতে রয়েছে।" বলা বাহুল্য, তখন আপশোস হ'ল কেন দ্বিতীয় পাটটা ফেলে দিলাম! ভাবলাম পুণ্যস্থানে সত্যই তো আমার অপরাধ ঠিক হয়নি—আমি পয়সা দেবার জন্য তো ফিরে গিয়েছিলাম—আমার জুতো হারাবার কথা তো নয়।

অবিনাশ—তবে যে হারালো শেষ পর্যন্ত?

আমি—বালিকাটি সিকিটা তো পেল না,—সেজন্য না হারিয়েও জুতা আমি পেলাম না। দেবতার বিচার বড় সূক্ষ্ম, অবিনাশ। তোমারই অপরাধে তুমি জুতা হারিয়েছ—জুতাচোর উপলক্ষ মাত্র—সে সরকারী দূত নয়, সে মা-কালীরই ভূত। জুতো চুরি শুধু সমস্যা নয়, জুতা বদলও একটা সমস্যা।

অবিনাশ—পুরানো জুতোর বদলে নতুন জুতো কিংবা ছেঁড়া জুতোর বদলে সুস্থসবল জুতো পরে চলে যাওয়াও তো জুতো চুরি ছাড়া আর কি? জুতোচো'ররাও খালি পায়ে আসে না।

আমি—না, শোনো, জুতো বদলের অন্যরূপও আছে। ভবানীপুরে শচীন-রবীনদের বাড়ীতে দিলীপের গান শুনতে গিয়েছিলাম। ফিরবার সময় দুপাটই পেলাম—কিন্তু একপাট আমার আলবার্ট আর একপাট অন্যের নিউকাট। দুটিই নতুন। তাই পরে বাড়ী এলাম। বেশি লোক যায়নি গান শুনতে। ভাবলাম বদল ভাঙ্গা যাবে, কিন্তু পরদিন গিয়ে আমন্ত্রিতদের তালিকা নিয়ে খোঁজ করলাম। কিন্তু কোনো হদিশ পেলাম না। ভাবলাম আমার চেয়েও অন্যমনস্ক মানুষ আছে? আমি অন্যমনস্ক কিন্তু উদাসীন নই—আমার অর্ধজুতেশ্বর লোকটি আবার রীতিমত উদাসীন। তিনি খোঁজও করলেন না।

তবে আমার শেষ পর্যন্ত লোকসান হয়নি—এ নিয়ে বিনামাবিনিময় নামে একটা কবিতা লিখ্‌লাম—সে কবিতাটায় আমি ৫৲ টাকা পেয়েছিলাম—জুতার দাম উঠে গেল। অবিনাশ, জুতো যে হারায় সে হাস্যাস্পদ, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না—নিজের স্ত্রীপুত্রও

একপাট এলবার্ট অন্যপাটি নিউকাট

শুনে হাসে। আমি যখন দুপাট দুরকমের জুতো পরে বাড়ী এলাম তখন বাড়ীতে হাসির রোল উঠল। বৌবাজার অঞ্চলে একটা সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলাম—খালি পায়ে ফিরে এলাম।

অবিনাশ—জুতোচোরদের সভায় যাও কেন? তাদের উচিত ছিল নতুন জুতো একজোড়া কিনে দেওয়া।

আমি—তারা তো জুতো চুরি করেনি, তাদের অপরাধ কি? শোন, যা বলছিলাম। গলায় ফুলের মালা। হাতে ছুটো ফুলের তোড়া—কপালে চন্দন—খালি পা, মোটর ছেড়ে বাড়ী ঢুকলাম—স্ত্রীপুত্র-কন্যা সকলেই হো হো করে হাসতে লাগল। অবিনাশ, জুতোহারার প্রতি স্ত্রীপুত্র-কন্যারও দরদ নেই—তারাও লোকসানের কথা ভুলে যায়। তুমি খড়ম ছেড়ে সত্বর জুতো কেনো গিয়ে। কাউকে এ লজ্জার কথা বলো না। খড়মের খটখটানিতে আর রসিকদের হাসায়ো না—বেরসিকদের রাগায়ো না।

অবিনাশ—ঠিক বলেছ—আমি যখন খালি পায়ে কালীবাড়া থেকে ফিরে গেলাম—বাড়ার সবাই হেসেছিল। জুতার বদলে খড়ম ধরেছি দেখে অনেকে মুচকি মুচকি হাসে।

আমি—সবাই হাসবে না—ভাই, কেউ কেউ খড়মী পেটা করবে।

নাম-বিকৃতি

শরৎচন্দ্রকে একবার একজন পণ্ডিত একখানি পত্র লেখেন। পত্রের উপর শিরোনামা ছিল—শ্রীমচ্ছরচ্চন্দ্র দেবশর্মা। পিওন বেচারা 'মচ্ছর'বাবুকে সারা গাঁয়ে খুঁজে না পেয়ে শেষে শরৎচন্দ্রের হাতেই পত্রখানি দিয়ে বলেছিল, "দেখুন দাঠাকুর, এই 'মচ্ছর'বাবুটি কে? এই নতুন লোক কার বাড়িতে এসেছেন?" শরৎচন্দ্র মচ্ছর-মেঘে কতকটা ঢাকা পড়লেও বুঝলেন, চিঠিখানা তাঁরই। রসচক্রে এই গল্প করে তিনি বলেছিলেন, "শ্রীমৎ শব্দের জন্য ততটা গোল নয়। কাছাকাছি ছুটো সন্ধির জন্যই গোল বেধেছিল। আমি তোমাদের ব্যাকরণের সন্ধির বন্ধনে বাঁধা পড়বার লোক নই—কোন নিয়মেরই বাঁধন আমাকে বাঁধতে পারেনি। আমার পিতৃদত্ত নাম শরৎচন্দ্র, শরচ্চন্দ্রও নয়। আমি আমার পিতৃদত্ত নামই শিরোধার্য করেছি, অকারণে সন্ধিবদ্ধ হতে চাইনি। পণ্ডিত আমাকে আমার নামের যথার্থ বানান সন্ধি করে শিখিয়ে দিল, তাতে আমি যে অপমান বোধ করেছিলাম তা মহাপুরুষদের যোগ্য 'শ্রীমদ্' যোগেও ঘোচেনি।'

দেশমান্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সতীর্থেরা নাম বদলাতে বলেছিলেন, তিনি তাঁর মাতার দেওয়া নামের বদল করেননি।

বাড়ির চাকরের সঙ্গে এক নাম থাকায় আচার্য যোগেশচন্দ্র অবশ্য বাল্যকালে পিতার সম্মতি নিয়ে নাম বদল করে নিয়েছিলেন।

নামের যে-কোন রূপ বিকৃতি ঘটলে সকল নামীই অপমান বোধ করেন। কারও নাম ঠিক ঠিক না লিখলে বা না ছাপলে নামীর প্রতি অশ্রদ্ধা সূচিত হয়।

একটি বিখ্যাত সংকলন-গ্রন্থে কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচির নাম যতীন্দ্রনাথ বাগচি ছাপা হয় এবং একখানি পাঠ্যপুস্তকে কবিবর

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছাপা হয়। দুজনে তাই নিয়ে রাগারাগি করছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। 'মোহন'কবি উকিলের চিঠি দেবেন সংকল্প করেছিলেন, এবং 'নাথ'-কবি টেক্স্ট বুক কমিটির নামে একখানা কড়া চিঠির মুশাবিদা করেছিলেন। দুজনেই খুব আত্মসচেতন মানুষ। আমি বললাম, "আপনারা ত দুজনে অভিন্নহৃদয় মিতে। 'মোহন' আর 'নাথ' আপসে বদলাবদলি করে নিলেই ত পারেন এক্ষেত্রে।" মোহন-কবি খুব চটে গিয়ে বললেন, "এ কি রসিকতার কথা? কতটা অমর্যাদার কথা বল তো। তোমার নাম যদি কালীদয়াল বা কালীবরণ ছাপে তাহলে কী মনে হয়?" সত্যই এ যে বড় অমর্যাদার কথা, তা স্বীকার করতেই হল।

আত্মভোলা কবি করুণানিধানের নাম অনেক স্থলে করুণানিদান ছাপা হত—কেউ কেউ চিঠিতেও তা-ই লিখত। দাদা বলতেন, "মরুক গে। যিনি করুণানিধান, তিনিই করুণানিদান। ইদানীং করুণাবিধানও চলতে পারে—করুণাটুকু থেকে বঞ্চিত না করলেই বাঁচি। অনেকে যে কিরণধনের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলে সেটাই আপত্তিজনক।" নাম সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য খুব কম লোকেরই আছে।

অল্পপরিচিত লোক অপরিচিতের সঙ্গে যখন কারও পরিচয় করিয়ে দেন, তখন তাড়াতাড়ি নিজের নাম নিজে বলাই ভাল, তিনি কী বলতে কী বলবেন, তার ঠিক কী? পরিচায়কের চেয়ে নিজেরই লজ্জা বোধ হবে বেশী।

এক সভায় সভাপতিত্বের প্রস্তাব করতে গিয়ে একজন তো বললেন, "আমি প্রস্তাব করি, কালীশেখর কবিদাস রায় সভাপতির আসন…" ইত্যাদি। সভাপতির কীরূপ সম্মানবর্ধন এবং সভার মুখবন্ধটা হল বুঝে দেখুন। সভাপতি-বরণেও নিজের নাম নিজেই প্রস্তাব করা নিরাপদ।

নামের মধ্যাংশ নিয়েই গোল বাধে বেশী। চিঠি লিখতে গিয়ে

অনতিপরিচিতের নামে চন্দ্র, নাথ, কুমার, মোহন, রঞ্জন কী যে লিখব ঠিক করতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে নামের মধ্যাংশ বাদ দেওয়া নিরাপদ। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। নামেব প্রথমাংশ যদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয় তবে পুরুষের পক্ষে এবং পুংলিঙ্গ শব্দ

আমি প্রস্তাব করি··

হলে নারীর পক্ষে মধ্যাংশ বাদ দেওয়া চলে না। দ্বিতীয তারাশঙ্কবেব আবির্ভাব হলে আমাদের তাবাশঙ্কব 'শ্রী'ভ্রষ্ট হলেন—কিন্তু শঙ্কব ত্যাগ করতে পারলেন না। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের প্রসন্ন

বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে নামের নারীত্ব ঘটে এবং অন্য কোন অতিপ্রসিদ্ধা ভাগ্যবতী মহিলাকে বুঝাবে। পুংলিঙ্গ সবিতা (সূর্য) নারীদের নামে চলছে কিন্তু সতীশিরোমণি সাবিত্রীকে ব্র্যাকেটে পুং লিখেও পুরুষের নামে চালান যাবে না। তবে আমরা সাবিত্রীবাবু বলতে পারি। এইভাবে সজনীবাবু, কুমুদিনীবাবু, মোহিনীবাবু, রমণীবাবু ইত্যাদি শুধু মুখে বলতে নয়, লিখতেও পারি। আহ্বানে ত চলেই। অবাঙালীরা এরূপ আহ্বানে বিস্মিত হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একবার এজন্য অবাঙালীদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। চিঠির শিরোনামা লিখতে বা পরিচয় দিতে গেলে এরূপ চলে না। নামের মধ্যাংশ যাঁরা নিজেরাই বাদ দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদেরও মান রেখেছেন—অন্যকেও অসুবিধা থেকে রেহাই দিয়েছেন। যাঁরা নিজেরাই মধ্যাংশ বাদ দিয়ে হাল্‌কা হয়েছেন —তাঁদের নামে যদি অনুক্ত স্থান পুরণ করা যায় তবে তাঁরা নিজেদের নাম ভারাক্রান্ত দেখে আদৌ খুশী হবেন না। অজিত দত্তের কথা বলতে গিয়ে যদি অজিতকুমার দত্ত বলা হয়, তাহলে অজিত ভায়া ভাববেন, অন্য কোন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে।

আমরা এখনও একটিম.এ শব্দের নামের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইনি —তাই মাঝে একটা কিছু বসিয়ে নামটাকে পূর্ণাঙ্গ করতে চাই। তাই অনেক স্থলে ভূদেব 'চন্দ্র' মুখোপাধ্যায় লিখতে দেখি। আমি নিজেই পরিমলকুমার গোস্বামী ও মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী লিখে অপ্রস্তুত হয়েছি। দুজনেই কুমার ন'ন, বিবাহিত।

যাঁরা নিজেরাই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই নাম ব্যবহার করেন—তাঁদের নামের পুংস্ত্ব সাধনের জন্য একটা মধ্যাংশ ব্যবহারও অপরাধ। ভবানী মুখোপাধ্যায় কি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের নামে মধ্যাংশ বসান চলে না। ফাল্গুনি—অবশ্য অর্জুন। কিন্তু ফাল্গুনী—ফাল্গুনী পূর্ণিমা। কাজেই স্ত্রীলিঙ্গ।

যাঁরা ডাকনামই লেখাতেও চালান—তাঁদের নামের সংস্কার সাধন করা যায় না—বিশু মুখুজ্যেকে বিশ্বনাথ মুখুজ্যে লেখা চলে না।

ভূতনাথবাবু নিজের নামের মধ্যাংশ ছাড়তে না পারুন, সমার্থক প্রমথনাথ চৌধুরী মশায় নামের মধ্যাংশ ছেড়েছিলেন। তাতে যাঁর সঙ্গে তাঁর নামের গোলমাল হত, সেই সমসাময়িক সাহিত্যিক প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মশায় থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে নাম-গোত্রে অভিন্ন প্রমথনাথ বিশী ভায়া অনাথ হতে অর্থাৎ নাথ ত্যাগ করতে পারেননি, তাঁর নাথের—'না', প্র-না-বি-তেও থেকে গিয়েছে। সমীরকুমার ও অনিলকুমারের 'কুমার'টা ছাড়াই ভাল। পবন, অনিল ও সমীর একার্থক। সর্পের বিষ আছে—ভুজঙ্গ, অহি, ফণীর বোধ হয় বিষ নেই—তাই এঁদের ভূষণ না হলেও চলে। অহীন্দ্র ফণীন্দ্র হলে ত কথাই নেই।

ঔপন্যাসিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল 'চন্দ্র' নয়, 'শ্রী'-ও ত্যাগ করেছিলেন। শ্রী (লক্ষ্মী) ত চন্দ্রের .বান, উভয়েই সাগরসম্ভূত, কাজেই ভাইবোন দুই-ই একসঙ্গে বর্জিত! শ্রীত্যাগটা গুরুর অনুস্থতি—নামের মধ্যাংশ ত্যাগে তাঁর মৌলিকতা ছিল। তখনও নামের মধ্যাংশ ত্যাগের রেওয়াজ হয়নি। শ্রীহীন চারু বন্দ্যো বলে 'সাহিত্য' পত্রিকা বিদ্রূপ করত। এখন তো স্ত্রীত্যাগ না হোক, শ্রীত্যাগ ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমধুসূদনের ভক্ত শ্রীমোহিতলাল এজন্য চারুবাবুর সঙ্গে বিতর্ক করেন, বলেন, শ্রী-টা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন। শ্রীত্যাগ জাতীয়তাবিরোধী। তাছাড়া শ্রী-টা থাকলে এখনও যে বেঁচে আছি, তার প্রমাণ হয়—শ্রী বাদ দিলে পত্র-পত্রিকায় নামের আগে 'চন্দ্রবিন্দু' বসাতে থাকবে। চারুবাবু বলতেন নিজে বিশ্রী হয়ে নিজের নামে শ্রী বসাই কী করে? অন্যে লেখে লিখুক। শ্রী বাদ দিলে নামের অঙ্গহানি হল, এ-কথা আজকাল অনেকেই মনে করেন না।

ইদানীং সাহেব-দত্ত বিজাতীয় বাবু অনুসর্গটা এবং ইংরেজী মিস্টার (মিঃ) উপসর্গটা এড়াবার জন্য সরকারী কাগজপত্রে বিশেষত সংবাদপত্রে শ্রী ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে—বিধর্মী বিজাতীয়ের নামেও শ্রী বসান হচ্ছে। শ্রীকে সাহিত্যিকরা তাড়ালে কি হবে সরকার তাকে মহাসমারোহে ফিরিয়ে এনেছেন। ভেবে দেখুন, শ্রীভ্রষ্ট হয়ে দেবতাদের কি অসাধ্য সাধনই না করতে হয়েছিল। আমি সমুদ্রমন্থনের কথা বলছি।

মোহিতলাল নামের আগে শ্রী না বসালে খুব রাগ করতেন।

নামের আগে না হোক, নিরুপাধিক নামে এখনও বাবু যোগ করতে হয়—বিশেষত আহ্বানে। তা না করলে মর্যাদাহানি হয়। উপাধির সঙ্গে মশায় লাগান এখন সেকেলে হয়ে পড়েছে।

পুরুষদের কথাই বলা হল—মেয়েরা নিশ্চয়ই রাগ করবেন—তাঁদের কথা কিছু বলার প্রয়োজন।

দ্বিজ ছাড়া অন্য বর্ণের মেয়েরা একদিন নামের সঙ্গে দাসী লিখতেন—এ যে খুবই অমর্যাদাকর, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা নামের আগে শ্রীমতী লিখতেন। শ্রীমতী না লিখলে এখন আর কেউ নামের অঙ্গহানি হল মনে করেন না। পরে তাঁরা সকলেই দেবী হলেন' খুব ভাল হল। তারপর এখন নামের মধ্যাংশও তাঁরা নিজেরাও ত্যাগ করেছেন, মাতাপিতাও এখন একটি শব্দেই নাম রাখেন! নামের বিকৃতির কোন সম্ভাবনা আর থাকল না। রমা দেবী, বেলা দেবী লিখলেই চলে। ইদানীং তাঁরা দেবীত্বও ত্যাগ করছেন। দেবীত্ব লাভের আগে কেউ কেউ গুপ্তা, ঘোষজায়া, চৌধুরানী লিখতেন। দেব-পত্নী সহজেই দেবী হতে পেরেছেন, দাস-পত্নী কিন্তু দাসী হতে পারেননি। রক্ষিত জায়া রক্ষিতা লিখতে পারেননি। অধিকাংশ উপাধির স্ত্রীলিঙ্গ হয়ও না। স্ত্রীলিঙ্গ রূপ থাকলেও ঘটকী, প্রামাণিকী, সাধ্বী, মোদিকা, সিংহী বা সিংহিনী কারও রুচিকর হয়নি। কাজেই ঐ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। এখন

পুংলিঙ্গ শব্দ হলেও ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, চট্টরাজ, ঘোষ, বসু, চক্রবর্তী ইত্যাদিও ব্যবহার করছেন। বিবাহিত অবস্থায় ও অবিবাহিত অবস্থায় উপাধি এক নয়, সে-হিসাবে অন্যের ভুল-ভ্রান্তি ঘটতে পারে। কোন কোন মহিলার একাধিকবার উপাধি বদলের প্রয়োজন হচ্ছে—কাজেই পূর্ববর্তী উপাধিতে মর্যাদাহানি হতে পারে। যেখানে সন্দেহ, সেখানে দেবী লিখলেই চলে, তাতে কেউ রাগ করবেন বলে মনে হয় না।

আর এক শ্রেণীর নামবিকৃতি ঘটে নামের বানান ভুলে। রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে নামের বানানটাকে শক্ত করে তুলেছিলেন, তাঁকে আর পুনরায় রত্নাকর বানান যায় না। তাঁর ভক্ত মধুসূদনও এখন স্বর্গে। তাঁর নামের ১২।১৪ রকম বানান পাই আমরা পরীক্ষার খাতায়। এঁদের নামবিকৃতি আমাদেরই পীড়া দেয় তাঁরা ত ভূলোকে নেই। তাই ছাত্রদের বলি, তোমরা মধুসূদন না লিখে শুধু মাইকেল লেখ, তিনি হিন্দুস্বর্গে যাননি খ্রীষ্টানস্বর্গে গিয়ে তিনি আর্কেঞ্জেল মাইকেল (দ্বিতীয় অবশ্য) হয়েছেন।

বঙ্কিমের নামটা খুবই সোজা। কিন্তু তবু পরীক্ষার খাতায় বঙ্গিম বানান দেখতে পাই। এতে বঙ্কিমের কী আসে-যায়, আমাদেরই লজ্জার কথা।

যাঁরা নিজেদের নামের বানান নিজেরাই ঠিক জানেন না—বিশুদ্ধ বানান লিখলে তাঁরা হয়ত নামের বিকৃতিই মনে করবেন। ঠিক বানান জেনেও তাঁরা ছাত্র-জীবনের বানান বদল করতে চান না। তাঁরা ভাবেন, "দেখ দেখি, আমার নামের বানান আমাকে অন্যে শেখাচ্ছে! আমি কি জানি না?" এরূপ অনেককে জানি।

ব্যোমকেশবাবু নিজের নামের বানান অনেক স্থলেই দেখতে পেতেন বোমকেশ। তবু তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন হৃষীকেশ। কেশে কেশে মিলিয়ে। ফলে হৃষীকেশবাবু নিজের নামের বানান দেখতে পান হৃষিকেশ, হৃশিকেশ, ঋষিকেশ। এক হৃষীকেশ নিজের

নামের বানান লিখতেন ঋষিকেশ। আমি বল্লাম—তোমার নামে একটা ভুল আছে—ঋষিকেশ হবে না ঋষিজট হবে। তাতে তিনি বিরক্ত না হয়ে বললেন, "বাবার দোষেই আমার নামের চেহারা এরূপ হচ্ছে—নামের বানান এত শক্ত যে, আমি সোজা করে নিয়েছি স্যার।" স্মরজিৎবাবু যখন নামের বানান লেখেন স্বরজিৎ—তখন তিনিও ঐরূপ কথাই বলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ শৌরীন্দ্রমোহন ন্যায়চুঞ্চু—নামের অর্থে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। চিঠিপত্রে চুঞ্চুর স্থলে তিনি চঞ্চু দেখে হাসেন, কিন্তু কেউ সৌরীন্দ্র লিখলে রাগ করেন, বলেন—সৌরি হল সূর (সূর্য)+ঞি=যম ও শনি, আর শৌরি হল শূর+ঞি=শৌরি শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিপুরারি ভায়া নিশ্চয়ই ছাপার অক্ষরে ত্রিপুরারী বানান দেখেন। তিনি বিরক্ত হন কিনা জানি না—তবে কথাসাহিত্যিক অসমঞ্জবাবু 'অসমঞ্জস' লিখলে রাগ করেন।

শ্রীমান কামাক্ষী বাবাজীব নাম কামাখ্যা বা কামাখ্যী লিখলে বা ছাপালে তাতে রাগ করতে পারেন। কারণ, কামাক্ষী পিতৃদত্ত নাম। দিগ্‌গজ পণ্ডিত পিতা ভুল করেননি। কামাক্ষী মা-দুর্গার একটি নাম। মণীন্দ্রবাবুর নাম মুনীন্দ্র লিখলে এবং মুনীন্দ্রবাবুর নাম মণীন্দ্র লিখলে রাগ করবারই কথা। অর্ধেন্দ্রবাবুকে অর্ধেন্দু বানালে সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে তাঁকে অর্ধেন্দু দান করা হবে।

নন্দলাল, নন্দদুলাল, নন্দগোপাল—তিনই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু একের বদলে অন্যটি লেখা চলে না।

মাসিক পত্রে নীরোদ নামটি দেখি—ইনি কি ক্ষীরোদের ভ্রাতা? নীরদ হতে নিশ্চয়ই এঁর আপত্তি আছে, থাকবারই কথা। নীরদের একটা মানে নির্ নাস্তি রদ (দাঁত) নেই যার।

নিত্যগোপাল ও নৃত্যগোপাল দুই নামই হয়। চিঠি লিখবার সময় জেনে নেওয়া ভাল কোন গোপালকে চিঠি লেখা হবে। ডঃ শশিভূষণ তাঁর নিজের নামের বানানটা যেন সর্বাগ্রে এম-এ ক্লাসের ছেলেদের শিখিয়ে দেন।

ধূর্জটিবাবুর নাম লিখতে হলে অভিধান দেখে নেওয়া ভাল।

মেঘনাথ—ইন্দ্র। মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ। কে বড়? মেঘনাদবাবু মেঘনাথ হতে যাবেন কেন?

কারও কারও নামের আসল বানান যুক্তিসহকারে শিখিয়ে দেওয়া ভাল। এক 'সুরতকুমার'কে বলেছিলাম, "বাপু, তোমার নাম সুরথকুমার। ও নাম আর লিখ না।" তাকে অভিধান দেখতে বলেছিলাম। শ্রীমতী পুষ্পিতাকে অভিধান দেখতে বলতে পারিনি।

এখন নিজের কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। আমার নামের বানান কম্পোজিটাররা অনেক সময় 'শুর্ধ' করে কালীদাস ছাপেন। এতে রাগ করবাব কিছু নেই। তাঁরাই ঠিক করেন। কালীচরণ, কালীকিঙ্কর, কালীপদ—কোনটাতেই ঈ—ই হয় না। দাস যোগে হ্রস্বত্বেব কোন সঙ্গত কারণ নেই। এ বিষয়ে আমার একটা থিওরি আছে। মহাকবি কালিদাস প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন—তা সকলেই জানেন। নিজেব নামেব বানান তিনি নিশ্চয়ই ভুল লিখতেন। একগুঁয়ে কবি, বড় হয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত কবি হয়েও সে-বানান আর বদলালেন না। সব পণ্ডিতই ঐ বানান শিরোধার্য কবে নিলেন। ব্যাকরণে নতুন সূত্র যোগ করে দিলেন। কালিদাস নিত্যসমাস হয়ে উঠল। জগতে একজনই কালিদাস—বাকী মা-কালীর সব দাসই কালীদাস। কাজেই দেখা যাচ্ছে কম্পোজিটাবরা আমাদেব চেয়ে ঢেব বেশী ব্যাকরণজ্ঞ। ওতে আমি আর রাগ করি না। তাছাড়া, নামরূপ ত অনিত্য।

অধ্যাপক ও সাহিত্যিক

অধ্যাপক—এই যে প্রসূনবাবু এবার ক'টা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা করলেন ?

সাহিত্যিক—তা দু-একটা করতে হয়েছে বৈকি। আপনি ক'টা করলেন ?

অধ্যাপক—বেশি নয়। ৮।১০টা হবে। তবে জানেন তো, ছাত্রসমাজের মধ্যেই আমাদের প্রধানতঃ এ-কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু শুধু ছাত্রেরাই তো রবীন্দ্রজয়ন্তী করে না, প্রত্যেক অফিস, আদালত, কারখানা, ক্লাব, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট এমনকি রেলষ্টেশন, কুস্তীর আখড়া, উদ্বাস্তু কলোনী, চা-খাবারের দোকান সর্বত্রই উৎসব হয়। তারা-তো আমাদের চেনে না—আপনাদেরই চেনে, আপনাদের লেখা গল্প-নভেল পড়ে, সিনেমায় আপনাদের বইয়ের ছবি দেখে,—কাজেই তারা আপনাদের কাছেই যায়। আপনাদের হয়ত সারা মাসই একাজ করতে হয়, এ আপনাদেরই জয়-জয়ন্তী। কি বলেন ?

সাহিত্যিক—অনেকেই আসে বটে, কিন্তু সবাই বলে প্রধান অতিথি হতে, সভাপতি করতে চায় কোন সাংবাদিক বা অধ্যাপককে। অবশ্য তাইত স্বাভাবিক। আশা করে, সাংবাদিকদের সভাপতি করলে সভার বিবরণটা ফলাও করে কাগজে বেরুবে। আর আপনারা বক্তা ভালো, কাজেই আপনাদেরই সভাপতিত্ব করা শোভা পায়। আপনাদের বক্তৃতা শোনবার জন্য তরুণরা উৎকর্ণ। অনেক নতুন কথা আপনাদের কাছে শোনবার প্রত্যাশা রাখে। পৌরোহিত্য বা সভাপতিত্ব করবার জন্য আপনাদেরই ডাকবার কথা নয় কি ?

অধ্যাপক—আপনারা যদি বক্তৃতা ভালো না করতে পারেন, তবে একটা কাজ করবেন। একটা বক্তৃতা লিখে সেটা মুখস্থ রাখবেন—

সেটাই প্রত্যেক সভায় বলবেন। এক লোক দু'সভায় থাকে না। কে তা ধরবে? কেই বা তা মন দিয়ে শোনে বা মনে রাখে?

সাহিত্যিক—আপনি তাই করেন বলে মনে হচ্ছে।

অধ্যাপক—আমাদের তা করার দরকার হয় না। বক্তৃতা করাই আমাদের পেশা। প্রত্যহই শুধু বাংলায় নয়, ইংরাজিতেও; কলেজে, ক্লাবে, সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করছি। আমাদের পড়ানোই তো প্লাটফর্ম লেকচার। বই ধরে ব্যাখ্যা করে পড়ায়, স্কুলের শিক্ষকরা।

সাহিত্যিক—তা ঠিক, আপনারা দাঁড়িয়ে উঠলেই দেখি—গোমুখ থেকে গঙ্গাপ্রবাহের মতো বচনধারা ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ে। থামতেই চায় না।—শুধু বক্তৃতা কেন? রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনারাই তো বিশেষজ্ঞ, আমরা তো শুধু উপভোগই করি, অবশ্য যতটা বুঝি ততটা।

আপনারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কত তথ্য, কত সত্য, কত নূতন নূতন তত্ত্ব নিষ্কাশন করছেন—। ল্যাবরেটরিতে আপনারা সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদ করে তার কঙ্কালের প্রত্যেক অংশের সার্থকতা দেখাচ্ছেন, কবির প্রেমপ্রেরণা, বাণী ও ব্রত সম্বন্ধে কত নতুন কথা শোনাতে পারেন, কবি যা হয়ত স্বপ্নেও ভাবেন নি তাও আপনারা দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে কবির রচনায় আরোপ করছেন। ইউরোপীয় সাহিত্য আপনাদের হস্তামলকবৎ, কাজেই তার সঙ্গে তুলনা করে আপনারা জগতের সাহিত্যে রবীন্দ্র-কাব্যের স্থান নির্দেশ করছেন—রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে কতটা আত্মসাৎ করেছেন—তা ধরিয়ে দিচ্ছেন এ সব তো আমরা পারি না স্যার। আমরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় গিয়ে কি যে বলব, ঠিক করতে না পেরে 'বাঁশবনে ডোম কানা' হয়ে যাই। নুনের পুতুলের সমুদ্রের জল মাপতে গেলে যে দশা হয়, তাই হয়, স্যার। আমাদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের বই থেকে দুই একটা কবিতা আবৃত্তি করে দায়

সারা করেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে ধৃষ্টতা করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। কাজেই স্যার আমাদের কাছে সভার জন্য কেউ এলে আমরা আপনাদের ঠিকানা বাৎলে দিই—আর সাংবাদিকদের ঠিকানাতো তারা জানেই।

অধ্যাপক—রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য অনেক গূঢ়তত্ত্ব সত্যই আমরা বলতে পারি, কিন্তু সাধারণ শ্রোতারা তা যে আদৌ বোঝে না। কেউ কেউ দেখি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তাঁদের হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, হয়ত বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়েছিলেন, হয়ত তাঁরা শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করতেন, তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেন, রবীন্দ্রনাথের আহার বিহার, রসালাপ, আচার আচরণ, রুচি প্রবৃত্তির কথা রসিয়ে ফেনিয়ে বলেন, তাঁদের ভাষণ বরং সাধারণ শ্রোতার উপভোগ্য হয়। কিন্তু সব সভায় তাঁরা একই কথা বলেন। ঐ সব ছেঁদো কথা বলতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা যা বলতে চাই তা শিক্ষিত লোকেরাই বোঝে না যে! মামুলী কথা তো আমরা বলতে পারি না।

সাহিত্যিক—আপনারা ছাত্রদের সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি পড়ান। কেমন ক'রে অনেক গূঢ় জটিল কথা সুবোধ্য ক'রে বলতে হয় তাও তো আপনারাই জানেন। সভার লোকদের কলেজ ক্লাসের ছাত্র মনে করলেই তো হ'ল।

আচ্ছা, মাফ করবেন, ছাত্রেরা কি আপনাদের বক্তৃতা বেশ বোঝে?

অধ্যাপক—মন দিয়ে শুনলে কতক কতক বোঝে বৈকি! পরীক্ষার খাতায় তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধু পড়াই না, রবীন্দ্রনাথের বিবিধ শ্রেণীর রচনা নিয়ে আমরা প্রবন্ধও লিখি, আমাদের কেউ কেউ বড় বড় বইও লিখেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব', 'রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনদেবতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমার স্থান', রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের এনাটমি, গেটে ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্যে হেলেনিজ্‌ম্‌, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে হেগেলিয়ানিজ্‌ম্‌, প্র্যাগমাটিজ্‌ম্‌, পেগানিজ্‌ম্‌, নিওক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌,
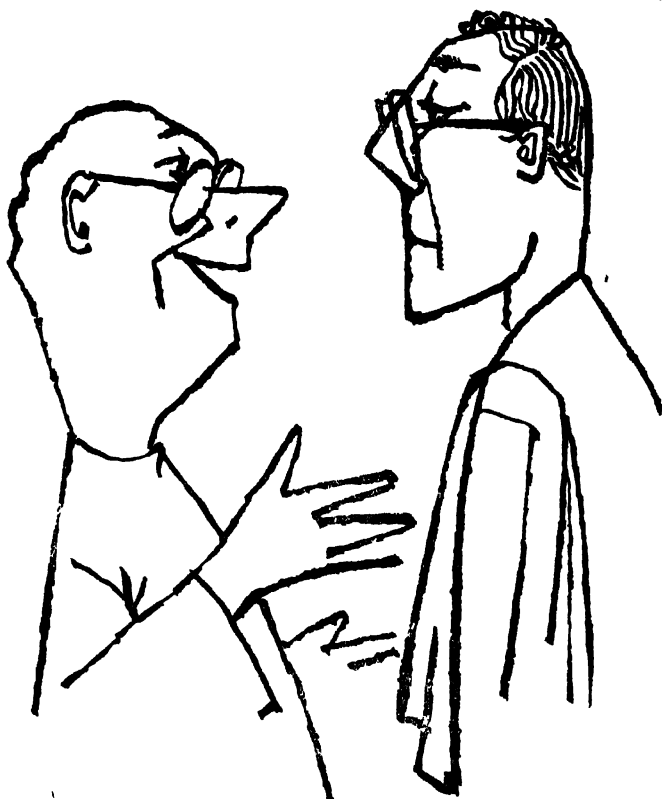
আমরা দেখাতে চাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমিকায় মার্কসিজমের প্রভাব' রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের প্রভাব' ইত্যাদি প্রবন্ধ পড়েছেন?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি বুঝতে চান—তবে ও সব পড়বেন। কেবল সুর ক'রে আবৃত্তি করলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগ

করা হয় না—গভীরে, অতি গভীরে প্রবেশ করতে হয়, রসের রসাতলে তলিয়ে যেতে হয়, ভাবের রকেটে অসীম অনন্তের পানে উধাও হতে হয়।

রবি শব্দটা নিয়েও গবেষণা চলে। গ্রীক, লাটিন ও হিব্রুতে Rabbi, ফরাসীতে Rabbin, ইংরাজিতে Robin Red breast এমন কি Robin Hood, Rob Roy এদের সঙ্গে যোগাযোগ দেখিয়ে 'রবি' নামের সার্থকতা দেখানো যায়।

সাহিত্যিক—Robber কথাটা বাদ দেন কেন ?

অধ্যাপক—বাদ তো গেল না, Robin Hood, Rob Roy। এ দুটো কথা জগদ্‌বিখ্যাত Robber-এরই যে নাম। আমরা যা বলতে চাই ব্যাখ্যা না করলে বুঝবেন না আপনারা।

সাহিত্যিক—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়ি বৈকি! তবে সে সব প্রবন্ধের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা ঢের বেশি সহজ ব'লে মনে হয়। সে সব পড়ে রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি তা বুঝি না-বুঝি, প্রবন্ধের লেখকরা যে কত বড় পণ্ডিত তাই স্তম্ভিত হয়ে ভাবি। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথকে আপনারা দার্শনিক বানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আপনাদের মতো এত বড় পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু।

অধ্যাপক—আমরা দেখাতে চাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন; তিনি ঋষিও। আপনারা তাঁকে বড় কবি বলেই জানেন; কিন্তু তিনি কত বড় কবি, ঋষি, ভাববাদী, ক্রান্তদর্শী তা জানতে হলেও আমাদের প্রবন্ধগুলো পড়তে হবে। আর পাণ্ডিত্যের কথা যদি বললেন, তবে শুনুন, কি পাণ্ডিত্যই বা আমাদের আছে ? অবশ্য চিরদিন বই নিয়েই আছি বটে, ভালো করে এম-এ পাশ করতে এবং ডক্টরেটের থিসিস লিখতে এক ওয়াগন বই পড়তে হয়েছে। আমাদের সবাই ডক্টর হননি বটে, কিন্তু থিসিস অনেকেই লিখেছেন এবং রাশি রাশি বই তাঁদেরও পড়তে হয়েছে। কিন্তু জানবেন—বিদ্যা হলো মহাসাগর, এখনও আমরা তার কূলে নিউটনের মতো উপল কুড়ুচ্ছি। বিদ্যা

যে মহাসাগর তা জানতে হলেও মহাসাগরের কূলে যেতে হয়—কলেজ ষ্ট্রীট থেকে তা অনেক দূর। আপনারা যদি আরো বড় লেখক হতে চান তবে খুব পড়াশুনা করবেন, না পড়লে নতুন আইডিয়া কোথায় পাবেন? আপনারা যা লিখছেন—আগেই অন্য ভাষায় লেখকরা লিখে গিয়েছেন কি না জানবেন কি করে? নিজের সীমাবদ্ধ কল্পনার চার পাশে ঘুরপাক খেলে আগাতে পারবেন না। জানেন তো কলুর বলদ সারা দিনই হাঁটে কিন্তু সারাদিনে—সারাদিনে কেন,—সারা জীবনেও এক পা আগায় না। তবে ভালো ভালো বই তো সবই ইংরাজিতে লেখা, জানি না আপনাদের ইংরাজিজ্ঞান কতটা; তবে এটাও ঠিক, আপনারা যতই এলোমেলোভাবে পড়াশুনা করুন একটা systematic academic training না পেলে পঠিত বিদ্যা organised crystallised বা systematised হয় না। বিদ্যাটা মনের স্তরে স্তরে সন্নিবদ্ধ হয় না, জীবনের অঙ্গীভূতও হয় না, বিদ্যার একটা শাখা অন্য শাখাকে সাহায্য করে না, শেষ পর্যন্ত কিছু মনেও থাকে না। কার্যকালে তাকে প্রয়োগ করাও যায় না। গৃহিণীপনার অভাবে তথ্যগুলির সমুচ্চয় ভাণ্ডার হয়ে উঠে না, লামবার-রুম (Lumber Room) হয়েই থাকে।

সাহিত্যিক—আমরা আপনাদের মতো বই বেশি পড়িনি বটে, কিন্তু এই বিশ্ব মহাগ্রন্থখানা আমরা খুব ভালো করেই পড়ি। তাতে অনেক তত্ত্বই আমাদের মনে Revealed হয়। বড় ডিগ্রীধারী কবিও আমাদের মধ্যে আছেন,—কিন্তু তিনি কি স্কুল-পলাতক কাজী নজরুল ইসলামকে কবিত্বে অতিক্রম করতে পেরেছেন? সাহিত্য বা শিল্প রচনার জন্য কি খুব বেশি বই পড়া বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে? বিস্তৃত ও গভীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, স্বীকার করি। সারাদিন বই নিয়ে কাটালে, বুকওয়ার্ম হলে চারিপাশের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ কি সম্ভব? আর আপনি যে গৃহিণীপনার কথা বললেন তার দ্বারাই তো আর্টিষ্টের

মনের ষ্টুডিও তৈরি—ভাণ্ডারের ঢের উপরে তার ঠাঁই। সেখানে অভিজ্ঞতাই সৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠে।

অধ্যাপক—অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু আর্থওয়ার্ম হয়ে থাকাটাও বাঞ্ছনীয় নয়। শিল্পসৃষ্টিতে বিদ্যাবত্তার ভূরি প্রয়োগ অনেক সময় রস সঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে তাও স্বীকার করি। কিন্তু বিদ্যা দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে শাণিত করে, উদার করে। মনের সমতল ভূমি এ-তে মালভূমিতে পরিণত হয়। মালভূমির উপরে রচিত সাহিত্য-সৌধ উচ্চতর হবেই। তা ছাড়া, সুশিক্ষিত সমাজের জীবন, চরিত্র ও পরিবেশ নিয়ে লিখতে গেলে বিদ্যার প্রয়োজন আছে বৈকি। চিরদিনই কি আপনারা পল্লীজীবন, বস্তি, কারখানা ও অশিক্ষিত সমাজ সংসার নিয়ে গল্প উপন্যাসই লিখবেন ? দেখুন, যতই আপনাদের বই বিক্রী হোক, যতই বই-এর সিনেমা ছবি হোক, যতই বিজ্ঞাপনে জয়ঢক্কা বাজুক; আমরা বই পড়ে যদি প্রশংসা করি তবেই বুঝবেন বই উৎকৃষ্ট হয়েছে। অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্যের ক্রেতা হতে পারে, সাহিত্যের নেতা নয়, সাহিত্য বিচারকও নয়, আমরাই আসল বিচারক।

সাহিত্যিক—তা কি স্যার আমরা জানি না ? আমরা আপনাদের ন্যায় সাধুজনের সাধুবাদ তুলেই তো বই-এর বিজ্ঞাপন দিই। বই লিখে তার ভূমিকা লেখানোর জন্য আপনাদের দ্বারস্থ হই। তাই আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধ কবিও ২৬ বৎসর বয়সের অধ্যাপকের ভূমিকার রক্ষাকবচ গলায় ঝুলিয়ে তাঁর সংকলন পুস্তক বার করেছেন। আমরা বই লিখি, আর আপনারা তার যাত্রাপথের পাথেয় দেন। বাপ-রে! আপনাদের উপেক্ষা করতে পারি ? আপনাদের কলমের একটা বল্লমী খোঁচায় ধনপতি সদাগরের পদাঘাতে খুল্লনার চণ্ডী-ঘটের মতো আমরা গড়াগড়ি যাই। পক্ষান্তরে যদি অনুকূল ফতোয়া দেন শুধু একটি মাত্র বাক্যে, তবে তা ছাত্রসমাজের শ্লোগান হয়ে ওঠে।

আপনাদের প্রশংসামূলক অভিমত পড়েই তো দেশের সরলচিত্ত লোকেরা বই কেনে। আমরা আপনাদের নামে বই উৎসর্গও করি। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে সময় পেলে হয়ত পড়েও দেখেন। আপনারা এক-একটি বিশেষণের ছাপ দিয়ে কবিদের ছেড়ে দেন, বৃষোৎসর্গের ছাপের মত সেই ছাপই তাঁদের আমরণ পরিচায়ক হয়ে থেকে যায়। সেই বিশেষণের অতিরিক্ত কিছু কবিদের রচনায় আছে কিনা তা তারা আর সন্ধানও করে না। নিশ্চয় আপনাদেরি কোন পূর্বসূরি একদিন ফতোয়া দিয়েছিলেন—

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥

অধ্যাপক—তা যাই বলুন, দেশের সাধারণ লোক আপনাদের বই কিনতে পারে,—পড়তেও পারে, কিন্তু তারা কোন বইকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না—আমরাই অর্থাৎ বিদ্বৎসমাজই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আমরা কেবল সমালোচনা করি না, আপনাদের বই সুরচিত হ'লে আমরা কলেজে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করি, তখন অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে ঐ বই-এ যদি কিছু রসবস্তু থাকে তবে তা নিঙড়ে নিঃশেষে বার করি, কত তত্ত্ব, তথ্য তার মধ্যে আবিষ্কার করি,—হয়ত আপনারা তা স্বপ্নেও ভাবেননি। অতএব বুঝতে পারছেন আপনারা লিখেই খালাস, আর বই-এর উপস্বত্ব আপনাদের উপভোগ্য—বাকি যা কিছু সব আমরাই করি।

সাহিত্যিক—নিশ্চয়! নিশ্চয়! তবে প্রকাশক, কাগজ বিক্রেতা, দপ্তরী ও মুদ্রাকরও অনেকটা করে। তাদের নামও উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক—যতই আপনারা সুলভ জনাদর পান—আমরা যতক্ষণ স্বীকার না করছি ততক্ষণ ও জনাদরের কোন দাম নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানই বড় বড় সাহিত্যিকদের চরম সম্মানও দেয় ডি-লিট উপাধি দিয়ে।

সাহিত্যিক—তা তো বটেই। শরৎচন্দ্র যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি পেলেন—তখন রসচক্র একটি গার্ডেন পার্টিতে তাঁর সংবর্ধনা করে। কথায় কথায় একজন বলেছিলেন—'এর আর কি দাম আছে? আপনার রচনা নিয়ে থিসিস লিখে কত কৃতী ছাত্র ডি-লিট ডিগ্রী পাবে। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আপনাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বরণ করেছে, তার কাছে ডি-লিট উপাধি তুচ্ছ।'

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—তুচ্ছ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের কাছে। আমার কাছে একেবারেই তুচ্ছ নয়। দেশের জনসাধারণ যতই জয়ধ্বনি করুক, যতদিন বিদ্বৎসমাজ তা স্বীকার করে স্বীকৃতির কোন নিদর্শন দেয়নি ততদিন আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিনি, ক্ষোভও মেটেনি।

অধ্যাপক—শরৎচন্দ্রের কোন ডিগ্রীই ছিল না, ডিগ্রীধারী বিদ্বৎসমাজকে তাই তিনি শ্রদ্ধাই করতেন। দেশের একটা বিদ্বৎসমাজ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে চূড়ান্ত ডিগ্রী দিয়ে তাঁর ক্ষোভ মিটিয়ে দিল।

সাহিত্যিক—আমি বলব,—শরৎচন্দ্রের এটা সাময়িক Inferiority complex ছাড়া আর কিছুই নয়। এই Inferiority complex আমাদের মধ্যে অনেকের আছে—সেটা আমাদের জয় করতেই হবে।

তবে ডিগ্রী পেয়ে যতই খুশী হ'ন—শরৎচন্দ্র নিজে সে উপাধির ব্যবহার কোনদিন করেননি,—নিজের নামে ডি-লিট যোগ করে নতুন করে Letter Heading-ও ছাপেননি—বাড়ীর দরজায় ট্যাবলেটও পরিবর্তন করেননি। কোন বইয়ে তাঁর নামের সঙ্গে ডি-লিট ছাপাও হয়নি—দেশের লোকও কখনও ডাক্তার শরৎচন্দ্র লেখেনি, মুখেও বলেনি। ওটা পদ্ম-ভূষণের মতই একদিনের মর্যাদা। আসল সাহিত্যিকের কাছে বিদ্বৎসমাজের দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রীরও মূল্য কিছুই নেই। ডাঃ রাজশেখর বসু লিখলে লোকে ভাববে ঐ নামের কোন অধ্যাপক বা চিকিৎসক। দেশের লোকই সাহিত্যিকদের মাথায় চূড়া পরিয়ে দেয়, বিদ্বৎসমাজ সেই চূড়ায় গুঁজে দেয় একটি ময়ূর পাখা।

সাহিত্যিকের বিড়ম্বনা

পূজার সাত দিন আগের কথা। প্রাতঃকালে উঠেই সুরপতি পত্নী কমলাকে বলল—দেখ আজ লেখাটা শেষ করাই চাই। সম্পাদক বলেছে—কাল দশটার মধ্যে পেলেও চলবে, লেখাটা দিতে পারলে গোটা তিরিশ টাকা পাওয়া যাবে।

কমলা মশারি গুটাতে গুটাতে বলল—আমার বাজারটা কিন্তু ক'রে দিতে হবে। তরিতরকারী কিছু নেই।

সুরপতি ফাউন্টেন পেনে কালি ভরতে ভরতে বলল—বাজার ? সে তো আধঘণ্টার কাজ। চট্ করে সেরে ফেলব। তুমি চা ক'রে দাও দেখি তাড়াতাড়ি।

এমন সময় দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হ'ল। সুরপতি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল—তিন বন্ধু সমাগত। দুজন কলেজের অধ্যাপক, একজন স্কুলের শিক্ষক।

সুরপতি বাইরের ঘরে এসে বন্ধুদের বসাল। তার মন বিরক্তিতে ভরে গেল—মুখে হাসির দিয়েশলাই জ্বেলে বললে—এস এস, এত সকালে যে অভিযান ?

অধ্যাপক রমেশ বলল—আমরা লেকের ধারে ভোরে বেড়িয়ে ফিরছিলাম, সুরেশ বলল—এস সুরপতির বাড়ীতে চা খেয়ে যাওয়া যাক তাই—

সুরপতি—বেশ করেছ।

পনেরো মিনিটের মধ্যে চা এল। নীতীন বলল—সেকি হে সুরপতি—শুধু চা দেখছি যে, খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাস ভালো নয়। তা ছাড়া, লেকের চার ধারে টক্কর দিয়ে খিদেও পেয়েছে। সুরপতি বাড়ীর ভিতর গিয়ে গৃহিণীকে উপদেশ দিয়ে ফিরে এল। একটু

পরে এল পাঁপর ভাজা ও হালুয়া। সুরপতি ক'দিন আগে বড়বাজার হতে দেড়টাকা সের সুজি এনেছিল খুকী আর খোকার জন্য। আর কিছু গাওয়া ঘি এনেছিল ভাতে খাওয়ার জন্য। তারই সদ্‌গতি হ'ল।

—আমার বাজারটা কিন্তু করে দিতে হবে

চা পানের পর বন্ধুদের মধ্যে নানা আলোচনা হ'তে হ'তে যা স্বাভাবিক তাই হ'ল অর্থাৎ বাধল তর্ক। বলা বাহুল্য, তর্কটা দেশের অবস্থা নিয়ে বিশেষতঃ কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট নিয়ে। দুজনের অভিমত কংগ্রেস

সরকার দেশের সর্বনাশ করছে—আর একজন কংগ্রেসের পক্ষপাতী। সুরপতির মন অন্য দিকে, সে প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারছিল না। সে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। বন্ধুদের আবির্ভাবে বাজার করাও হ'ল না—লেখাটাও শেষ করা হ'ল না। আর একবার চায়ের বরাত হ'ল; বন্ধুদের পূজাবকাশ সুরু হয়েছে। স্কুল-কলেজের তাড়া নেই। ক্রমে ১০টা বাজলে নীতীন বলল—ওটা থাক এখন। রমেশ বলল—আরে সুরপতি বেলা ২টার সময় আফিস যায়—তাড়াতাড়ি কিসের? ফলে, তর্ক চলতে লাগল। বাড়ীর ভিতর হ'তে সুরপতির মাঝে মাঝে ডাক আসছিল। সে মুখ ম্লান ক'রে বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আসছিল। বন্ধুরা তর্কে আত্মহারা। বেলা ১২টার সময় সভাভঙ্গ হ'ল।

সুরপতি স্নানাহার ক'রে ডাকের চিঠি নিয়ে বসল। প্রথম চিঠিখানা পোষ্টকার্ডের—তাতে মিবাট হ'তে সুবপতির খুড়তুতো ভগিনীপতি লিখেছেন—'সাত দিনের মধ্যে একটা তিনখানা ঘরের বাড়ী দেখ। যদি না পাও, তাহলে আমি সপরিবারে তোমার বাসায় উঠে একটা বাড়ী খোঁজ ক'বে নেব।' চিঠি পড়ে সুরপতি চমকিয়ে উঠল। দ্বিতীয় চিঠিখানা খামের—তার মধ্যে সুরপতির মামাতো বোনের জন্মপত্রিকা। মামা লিখেছেন—'এই জন্মপত্রিকা নিয়ে তুমি পত্রপাঠ শিবপুরে গোবিন্দ মিত্রের সঙ্গে দেখা কর। গোবিন্দ মিত্রের উপর নির্ভর ক'রে থেক না। তুমি যে পাত্র দুটোর সন্ধান দিয়েছিলে—তাদের বাড়ীও যাবে। তাঁরা কি বলেন জানাবে। সেই যে ছেলেটি রেলে চাকরি করে—তার অফিসে গিয়ে তার মাহিনা ও Prospect সম্বন্ধে জেনে খবর দিও।' তৃতীয় পত্রখানি একজন ধনী আত্মীয়ের। তিনি লিখেছেন—তার কন্যার বিবাহ ২০শে জ্যৈষ্ঠ, মেয়েটি মা-মরা। অতএব মেয়েটির স্বর্গতা মায়ের কথা উল্লেখ করে তাঁর জবানি একটা খুব Pathetic কবিতা লিখে ভালো করে ৫০০খানা ছাপিয়ে ভি পিতে তাঁর নামে পাঠাতে হবে। তাঁর পত্নী

পুরীধামে মারা যান, সেটারও উল্লেখ থাকবে। জামাই একজন ইন্‌জিনিয়ার তাকে উদ্দেশ করেও কতকটা লিখবে, বলা বাহুল্য মৃতা পত্নীকে উদ্দেশ করেও লিখতে হবে। শেষে ভগবানের কাছে নবদম্পতির কল্যাণ-কামনা থাকবে।

চতুর্থ পত্রখানিতে গ্রামের এক জ্ঞাতি খুড়ো লিখেছেন—তাঁর পুত্র অসুস্থ, তাকে মেডিক্যাল কলেজে একবার দেখানো দরকার। সেজন্য তাঁর পুত্রকে লইয়া তিনি ও তাঁর স্ত্রী ২।৪ দিনের মধ্যেই সুরপতির বাসায় আসছেন।

পঞ্চম পত্রের মধ্যে সুরপতি পেল—দুইটি রোল নাম্বার কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার। বহরমপুর হ'তে তার এক বাল্যবন্ধু পাঠিয়েছেন। ট্যাবিউলেটারের কাছ হতে এদের পাশ ফেলের খবর জেনে পাঠাবে। যদি ফেল হয় তাহলে তাদের পাশ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সুরপতি যখন পরীক্ষক সাহিত্যিক এবং খবরের কাগজে কাজ করে, তখন নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের সঙ্গে তার আলাপ এমন কি বন্ধুত্বও আছে। বার এফ-পি ৫৩ তাঁর দাদার বড় মেয়ে। এটি পাশ না হলে কিছুতেই চলবে না—কারণ তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ছেলেটা এবার পাশ না হয় আসছে বার হবে। তার জন্য তত চিন্তা নেই। অণিমা যদি পাশ না হয় তবে ভাইসচ্যান্সেলারকে বলবে পাশ না হলে তার বিয়ে হবে না। তাকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে হবে। অরক্ষণীয়াদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক্ Consideration থাকা উচিত নয় কি?

পাব্লিশারের একখানা পোষ্টকার্ড ছিল—তাতে লেখা ছিল—'আপনার পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে যাবেন। বইখানা আমাদের পছন্দ হ'ল না। আপনার লেখায় লোমহর্ষণ কিছু নেই, কোন আবধৌতিক ব্যাপারও নেই। অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী নেই, খুনজখম দাঙ্গা ইত্যাদিও নেই। এসব না থাকলে পাঠকরা বই কেনে না।'

একটা বুকপোষ্ট ছিল—তাতে মেদিনীপুর জেলার গ্রাম হতে

একজন পাঠশালার শিক্ষক কতকগুলো কবিতা পাঠিয়ে অনুরোধ করেছে—কবিতাগুলো দয়া করে সংশোধন করে দেশ, বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবেন।

আর একখানা পত্রে গ্রামের শিক্ষক ম'শায় লিখেছেন—তাঁর ছেলে আই-এস্-সি পাশ করবে এবার। তাকে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকাতে হবে। এজন্য এখন থেকে যে তদ্বির করার প্রয়োজন সুরপতিকে তা করতে হবে।

পত্রগুলো পড়ে সুরপতির মাথা গরম হয়ে গেল। সে ভেবেছিল অফিস কামাই ক'রে লেখাটা শেষ করবে। কিন্তু এরূপ মনের অবস্থায় লেখা জমবে না—ভেবে সে অফিস যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হ'ল। কমলাকে বলল—একটা ঝোলা খবরের কাগজে জড়িয়ে দাও—আসবার সময় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হ'তে কিছু কিছু কিনে আনব।

সুরপতি খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে। সে অফিস থেকে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে এসে আলু বেগুন কিনে বেরুতেই একখানা মোটর তার সামনে থেমে গেল! মোটর হ'তে সুরপতির প্রাক্তন অধ্যাপক শঙ্করবাবু সুরপতিকে কাছে ডেকে বললেন—মোটরে উঠে পড় চট ক'রে।

সুরপতি বলল—ব্যাপার কি? বলুন স্যার।

শঙ্করবাবু বললেন—গাড়ীতে ওঠ তারপর বলছি।

ট্রামের ভীড় এড়ানো গেল ভেবে আশ্বস্ত হয়ে সুরপতি গাড়ীতে উঠে বসল। শঙ্করবাবু বললেন—আমি একটা সভার পৌরোহিত্য কবতে যাচ্ছি—এদের একজন প্রধান অতিথি চাই। আমি বলেছিলাম পথ থেকে কিংবা মিত্রঘোষের দোকানে খবরের কাগজে মুড়ি খায় এই সময় যারা তাদের একজনকে তুলে নেব। তা তোমাকে পাওয়া গেল ভালই হ'ল।

সুরপতি—আমার যে কাজ আছে স্যার। ঐ দেখুন ঝোলায়

আনাজপত্র, বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে। সন্ধ্যার ট্রেনে সপরিবারে আমার এক আত্মীয় আসবেন। সঙ্গে এই ঝোলা—

শঙ্করবাবু—ঝোলাটার ভার আমি নিচ্ছি। ওটা গাড়ীতে থাকবে। এটা হাতে করে সভায় যেতে হবে না। এই একঘণ্টার মামলা, বুঝলে। গিয়েই নমোনম ক'রে সেরেই চলে আসব।

গাড়ী হাওড়ার পুলের উপর উঠতেই সুরপতি বলল—এ যে কলকাতার বাইরে চললেন স্যার।

শঙ্কর—আরে এই হাওড়ায় সভা।

সভা হাওড়াতে নয়—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলল গাড়ী। শেষে উত্তরপাড়ায় একটা বড় বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী লাগল।

অনেক হাঁকডাকের পর সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। কারণ, শ্রোতার একান্ত অভাব। কয়েকটি বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক বসে আছে। যুবকেরা শ্রোতার সন্ধানে বাজারের দিকে গিয়েছে। ফুটবল ম্যাচ খেলা শেষ হওয়ার পর সভা এক রকম জম্‌ল। কিন্তু গান, বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ আর শেষ হয় না। গলায় মালা পরে সুরপতি ছটফট্ করতে লাগল। গলায় যেন তার সাপের মালা। কিন্তু সরে পড়বার উপায় নেই—কলকাতা হতে দূরে, সভাপতির মোটরেই ফিরতে হবে। তাতে আলু পটল মূলা পুঁই ডাটা রয়েছে। শেষে রাত্রি ৯টার সময় প্রধান অতিথি ও সভাপতির অভিভাষণ। সুরপতি দুচার কথা বলেই বসল। কিন্তু সভাপতির কথা আর ফুরায় না। তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক আবোল তাবোল বক্‌লেন। সভার পর তাঁরা যখন এস্‌প্ল্যানেডে পৌঁছুলেন তখনও ট্রাম আছে। সুরপতি শঙ্করবাবুকে বলল—'স্যার, এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন আমি ট্রামে চড়ি। অতদূর আর গাড়ী কেন নিয়ে যাবেন।' শঙ্করবাবু দু'বার, 'সে কি কথা, তাও কি হয়,' বলে সুরপতিকে নামিয়ে দিলেন। সুরপতি রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরে দেখেন—তাঁর মাসতুতো দাদা ব্রজেনবাবু বাইরের ঘরে একটা

থেলো হুঁকায় তামাক টানছেন। সুরপতি ঘরে ঢুকতেই ব্রজেন-বাবু বলে উঠলেন—'এই যে সুরপতি। কিছুতেই ব্যাটারা আসানসোলে মেয়ে দেখতে গেল না, যাওয়া আসার খরচ পাঠালাম—তাও বেমালুম হজম করল। কাজেই গীতাকে নিয়ে এলাম দেখাতে। তোমার বৌদিও সঙ্গে এসেছেন। যাকে বলে কন্যাদায়। যাক এখন ব্যবস্থা কর। কাল সকালে চল একবার বরানগর যাওয়া যাক। কবে কখন ক'জন আসবে, সব জেনে শুনে আসা যাক।'

সুরপতি ম্লান মুখে হাসি টেনে বলল—আচ্ছা তাই হবে। আপনাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো? বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হয়নি তো?

ব্রজেন—বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হয়নি। তোমাকে দেখলাম এ অঞ্চলের সবাই চেনে হে। আমাদের খাওয়াদাওয়া সারা। তোমার এত রাত কেন? আমি এক ডাব তামাক সঙ্গে এনেছিলাম—বসে বসে সব শেষ করলাম।

সুরপতি—কাজ ছিল। আপনি আগে কোন পত্রাদি দেননি কেন? ষ্টেশনে যেতাম।

ব্রজেন—পত্রও দিয়েছিলাম—কেন পাওনি বুঝতে পারছি না। ভোলা হারামজাদা হয়ত পোষ্টই করেনি। যাক তাতে আর কি হয়েছে। তুমি যাও হাতমুখ ধোও গিয়ে। পরে সব কথা হবে। নিজের ভাইয়ের বাড়ী আসব—তার আবার সংবাদ দেওয়ার কি দরকার? সুরপতি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বৌদিদিকে প্রণাম করে গৃহিণীকে বললেন—আমি কিছু খাব না। খেয়ে এসেছি। এঁরা কখন এলেন?

কমলা—বলি সব কথা। বেলা দুটার সময় বিন্দুমাসী এলেন একদল ছেলে মেয়েদের নিয়ে। তাঁরা উঠলেন ৪টার পর। ঘরে কিছু নেই। এদিকে ঝি আসেনি। খুকীকে দিয়ে দোকান হতে খাবার

আনালাম ছু টাকার। তাঁরা চলে গেলে বাসন মাজতে বসলাম—ঘর দুয়ার ঝাড়ামোছা করলাম। তারপর উনুন ধরিয়ে আমাদের জন্য রুটী তৈয়ের ক'রে তুমি যে ক' পাতা লিখেছ তা নকল করতে বসলাম। তারপর ৭টার সময় এঁরা এলেন। আবার এক টাকার খাবার আনালাম খুকীকে দিয়ে। তারপর আবার উনুন ধরালাম। বাজার হয়নি, ঘরে কিছুই ছিল না। ওবেলা পাঁপর ভাজতেই তেলটুকু শেষ হয়েছিল। খুকীকে পাঠিয়ে তেল কিনে আনালাম। মাখনদের বাড়ী হতে ক'টা পটোল গোটা দুই বেগুন আর একফালি কুমড়ো আনালাম। ঘরে কয়েকটা আলু, ডাল, আর পোস্ত ছিল, হয়ে গেল কোন রকমে। খুকী আর খোকাকে দুধ দিইনি খেতে। তোমার এত দেরী কেন? ভেবে মরি।

সুরপতি—শঙ্করবাবু আমাকে এক সভায় উত্তরপাড়ায় ধরে নিয়ে গেলেন। কথা ছিল প্রবোধের প্রধান অতিথি হবার, সে একটা ইষ্টিমার পার্টিতে চলে গেছে স্ফূর্তি করতে। আর আমার এই কর্মভোগ। শঙ্করবাবুকে মিথ্যে করে বলেছিলাম—একজন আত্মীয় আসবে। হায়রে তাই সত্য হ'ল। গুরুজনকে মিথ্যাকথা বলার প্রায়শ্চিত্ত।

কমলা—কাল কিন্তু সকালে উঠে আগেই রেশন এনে দিও। এঁরা এসেছেন খেতে দেব কি? তারপর বাজার ক'রে অন্য যা করবার কোরো।

সুরপতি শয়নঘরে গিয়ে দেখল—পাশাপাশি দুইটা মশারি টাঙানো। রাত্রে একটা মশারির ভিতর ব্রজেনবাবু ঢুকে দশমিনিটের মধ্যে নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন। সুরপতি দেখল, এরূপ নাসাগর্জনে ঘুম হবে না—ভালই হ'ল, লেখাটা শেষ করা যাক। সুরপতি আলো জ্বেলে রাত চারটা পর্যন্ত জেগে তার লেখাটা শেষ ক'রে যখন একটু ঘুমিয়েছে, অমনি ব্রজেনবাবু জেগে উঠে ডাকলেন—ভায়া! উঠে পড়! ভোর হয়েছে। বরানগর যেতে হবে।

নামের মানে

যাঁরা ছেলেদের নাম রাখেন দেবদেবীদের নামে অথবা তাঁদের নামে দাস, চরণ, প্রসাদ, কিংকর ইত্যাদি যোগ দিয়ে, তাঁরা নামের অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন। পুরাণের নামগুলির বেলায় অর্থের দিকে দৃষ্টি না রেখে নামের চরিত্রবৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা হয় (যেমন—লক্ষ্মণ, ভরত, দিলীপ, শান্তনু, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি)। আর এক শ্রেণীর নামকরণে শব্দগুলির অর্থ থাকলেও অর্থে গুরুত্ব আরোপ না ক'রে শব্দের লালিত্য, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদির দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। এগুলি সব বাংলা কবিতা হ'তে আহৃত। যেমন—অমিয়, পরিমল, পুলক, জ্যোৎস্না, প্রফুল্ল, প্রসূন, কুমুদ, কমল, নবনী, সমীরণ, কিংশুক, নীহার, তুষার, শিশির, মলয়, নিশীথ, অমল, বিজন, বিমল। একদিন পরীক্ষা করে দেখা গেল—ছেলেরা নিজেদের নামের মানে জানে কিনা। উপলক্ষও হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যের পাঠনার কক্ষে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করল—'স্যার, নামের একটা মানে থাকে তো?' পার্শ্ববর্তী ছেলেটিকে দেখিয়ে সে বলল,—'একে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর নামের মানে কি? তা ও বলতে পারছে না।'

আমি—নাম একটা সংকেত মাত্র, তা হলেও সাধারণতঃ নামের একটা মানে থাকে। তবে অনেক মাতাপিতা নামের মানে না জেনেই ছেলেমেয়েদের নাম রাখেন। তাঁদের কাছে নাম একটা ধ্বনি সংকেত মাত্র, অর্থ যা হয় হোক গে। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার কন্যার নাম রেখেছেন—সবিতা। সবিতার অর্থ যে সূর্য—ওটা তো পুংলিঙ্গ শব্দ। তিনি বললেন,—লিঙ্গটিঙ্গ বুঝি না—অনেকে মেয়েদেরই ও নামটা রাখে—তাই ওর

এম-এ পাস করা মাসী নাম রেখেছিল, কেউ আপত্তি করেনি। এঁর কাছে নামের কোন মানে নেই।

তুমি ত্বিষাম্পতির কথা বলছ তো? ও লিখত তিষাম্পতি আমি বলায় বানান বদল করে ত্বিষাম্পতি লেখে এখন। নামের মানেটা বলে দেওয়া হয়নি। ত্বিষাম্পতি, তুমি তোমার নামের মানে জানো না?

ত্বিষাম্পতি—না স্যার, বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন,—তিনি মানে জানেন না। তাঁর পণ্ডিত মশাই নাম রেখেছিলেন।

আমি—তোমার নামেব মানে সূর্য। ত্বিষ্ মানে দীপ্তি, জ্যোতি :—ত্বিষাম্—ত্বিষ্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন। (চয়স্ত্বিষামিত্যব-ধারিতং পুরা—শিশুপাল বধ)। পতির সহিত অলুক্ তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। বুঝলে এখন। পণ্ডিত মশায় যথাযোগ্য স্থলে বা গলে মুক্তার মালা দেননি। শিশুপাল বধের যোগ্য নাম বটে।

দিলীপ—বাংলায় কথাটা কি চলে স্যার?

আমি—মেঘনাদবধে দুইবার প্রয়োগ আছে—"কিংবা ত্বিষাম্পতি সহ ইন্দুসুধানিধি।" "নমে ত্বিষাম্পতি—দূতী উষার চরণে।"

আচ্ছা, দিলীপকুমার, ত্বিষাম্ না হয় তার নামের মানে জানে না। শব্দটা খুবই শক্ত।—তুমিই কি জানো তোমার নামের মানে?

দিলীপ—জানি স্যার, দিলীপ ছিলেন রামচন্দ্রের পিতামহ।

আমি—দিলীপ রামচন্দ্রের পিতামহ ন'ন, তিনি দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহেরও পিতা, যাক তুমি তো—দিলীপ নও, দিলীপকুমার। অতএব তুমি রামচন্দ্রের প্রপিতামহ অর্থাৎ—

মধু—রঘু, স্যার। সত্যেন দত্তের 'আমরা' কবিতায় তাঁর কথা আছে।

আমি—রঘু যে-সে রাজা ছিলেন না। তিনি অনেক রাজ্যে ঘুঘু চরিয়েছিলেন।

ইনি হ'লেন দ্বিতীয় দিলীপ।—এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রথম

দিলীপ। তাঁর কুমার হলে—তুমি ভগীরথ। তিনিও যে-সে লোক ছিলেন না। ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন স্বর্গ থেকে। কাজেই এ অর্থেও তোমার নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তবে রঘু আর কতটুকু দিগ্‌বিজয় করেছিলেন তুমি যদি দিলীপকুমার না হয়ে ফিলিপকুমার হতে তা হলে তাঁর চেয়ে ঢের বেশী বড় দিগ্‌বিজয়ী হতে পারতে।

দিলীপ—কে স্যার ?

আমি—কেন আলেকজাণ্ডার ফিলিপের পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালই ফিলিপকুমারকে নিয়ে নাটক লিখলেও দিলীপকুমার নামের প্রবর্তক—তারপর এখন বাংলা দেশে হাজার হাজার দিলীপকুমার পরীক্ষার্থীদের তালিকায় দেখা যায়। তারপর নীরদ, তোমার নামের মানে কি ?

নীরদ—মেঘ স্যার। নীর হলো জল, জল দেয় বলে মেঘ, নীরদ।

আমি—তুমি তোমার নামের মানে জানো দেখছি। কিন্তু আর একটা মানে যে আছে। 'রদ' শব্দের অর্থ দাঁত। নির্ নাই রদ যার সেই নীরদ, তুমি কি দন্তহীন ? বরং তুমি দন্তুর,—কারণ, তোমার সামনের ছুটি দাঁত বেশ বড় বড়, দ্বিরদ-ও হতে পারতে। তারপর অনিলকুমার। অনিল তো 'পবন'—আর কুমার তো 'নন্দন'। তুমি কুমারটা নাম থেকে বাদ দাও। কারণ বুঝেছ ? তারপর জনার্দন তোমার নামের মানে জানো ?

জনার্দন—জানি স্যার, 'বিষ্ণু'।

আমি—কেন এ নাম হলো বলতে পার ? তা না জানলে পুরা মানে জানা হ'ল না। নিশ্চয়ই তুমি জানো না। জন হচ্ছে 'পঞ্চজন' নামক দৈত্য, পঞ্চজন হিরণ্যকশিপুর পৌত্র একটা অসুর, তাকে অর্দন করেন অর্থাৎ বধ করেন বলে বিষ্ণুর নাম জনার্দন। ঐ পঞ্চজনের হাড়ে যে শাঁখ তৈরী হলো তাই হচ্ছে পাঞ্চজন্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বার বার বাজত তা শ্রীকৃষ্ণের মুখে।

জনার্দন—আমাদের নামের ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যাচ্ছে আঠারোটা পুরাণে টান পড়ে।

আমি—কান ধরে টানলে মাথা তো আসবেই। এখনো হিন্দুদের নামগুলো পুরাণাশ্রিত। বেশিদিন তা থাকবে না। আশিস, অমিয়, পুলক, কিরণ, হিরণ, চঞ্চল, প্রশান্ত, সুনীল, মৃণাল ইত্যাদি নামে দেশ ভরে গেলে আর পুরাণে টান পড়বে না।

তারপর তরুণকুমার—তোমার নামের মানে তুমি নিশ্চয় জানো। তবে তুমি তো একদিন বুড়ো হবে। চিরদিন তরুণ থাকবে না। তখন ঐ নাম তোমাকে লজ্জা দেবে না কি?

তারপর—ননীগোপাল তুমি তো ননীচোরা গোপাল—তোমার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

তারপর কামিনীকুমার—তোমার নামের অর্থ সোজা, কিন্তু কামিনীকুমার কে নয়? ম্যাকডাফও কামিনীকুমার। এক মান্ধাতা কামিনীকুমার নয়, সে তার বাপের গা হ'তে জন্মেছিল।

সুনীতিকুমার, তোমার নামের মানে নিশ্চয় তুমি জানো?

সুনীতি—না স্যার।

আমি—ধ্রুব, তুমিও ধ্রুবের মতো বিদ্যারণ্যে তপস্যা কর, ধ্রুবলোক অর্থাৎ স্থায়ী সরকারী চাকরী পাবে।

তারপর মধুসূদন তোমার নামের মানে কি? তা বলবার আগে বানানটা বলো—আমরা পরীক্ষার খাতায় পনেরো রকম বানান পাই। শব্দটা তোমাকে প্রত্যেক পরীক্ষার খাতার উপরে ও ভিতরে বার বার লিখতে হবে।

মধু—বিষ্ণু, স্যার। বানানটা ঠিকমত তৈরী আছে।

আমি—কেন বিষ্ণুর এ নাম হলো? তা না বললে পুরা অর্থ বলা হলো না।

মধু—না স্যার, তাতো জানি না।

আমি—মধু নামে এক দৈত্য ছিল, তাকে সূদন করেন অর্থাৎ বধ করেন বলে বিষ্ণুর নাম মধুসূদন।

মধু—দৈত্যের নাম মধু? আশ্চর্য তো!

আমি—তা হবে না কেন? কত দুরন্ত ছেলের নাম তো সুশীল, সুশান্ত, সুবোধ। তার ভাই কৈটভ—সে আসুরিক নামের মর্যাদা রেখেছিল। তাকে বিষ্ণু বধ করেন। বিষ্ণু শুধু মধুসূদন নন—'মধুকৈটভারি'। কৈটভের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেচারা মধু বধ্য হয়ে উঠল। যাই হোক, আর একজন দৈত্যের নাম মধু ছিল—সে কিন্তু খুব ভালো লোক ছিল—সেই মধুপুরী নামে যমুনার তীরে রাজধানী গড়েছিল। এখন তার নাম মথুরা। এ মধুকে আর বধ করতে হয়নি, বেচারা রোগে মারা গিয়েছিল। তার সূদন কেউ নেই! মধুর সঙ্গে লঙ্কার সম্বন্ধ ছিল—মধু ছিল রাবণের ভগিনীপতি। তার ছেলে লবণকে বরং বধ করতে হয়েছিল শত্রুঘ্নকে।

মধু—মধুর ছেলে লবণ, অসুরদের নামগুলি তো বেশ স্বাদু!

আমি—যাক—রমণীমোহন, তোমার নামকরণটা বড়ই অসতর্কতার পরিচয়, তোমার নামের মানে নিয়ে টানাটানি করা বিদ্যালয়ের পক্ষে অনুপযোগী।

তারপর ঐ কোণের ছেলেটির নামটা কি—ভুলে গেছি—কি নাম তোমার?

ষোড়শী—আমার নাম ষোড়শীমোহন, কিন্তু সবাই বলে সরসীমোহন।

আমি—তারা ঠিকই করে, নাম যিনি দিয়েছেন তাঁর অবিবেচনার সংশোধন করেছে তারা। তুমি নিজের নাম সরসীমোহনই লিখো। ইংরেজীতে এক বানানই চলবে। সরসীমোহন—সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করে যাহা অর্থাৎ কুমুদ কমল।

মধু—ওর আসল নামের মানেটা তো হলো না, স্যার।

আমি—থাম, ডেঁপো ছেলে। ঐ নূতন ছেলেটির নাম কি?

মধু—ও স্যার গোলক।

আমি—তুমি গোলক না—গোলোক ?

গোলোক—আমি গোলক, স্যার।

আমি—গোলক ভূ-গোলক, চর্ম-গোলক (ফুটবল), অক্ষিগোলক, গোলকধাঁধা, রসগোলক (রসগোল্লা)—এর মধ্যে তুমি কোন
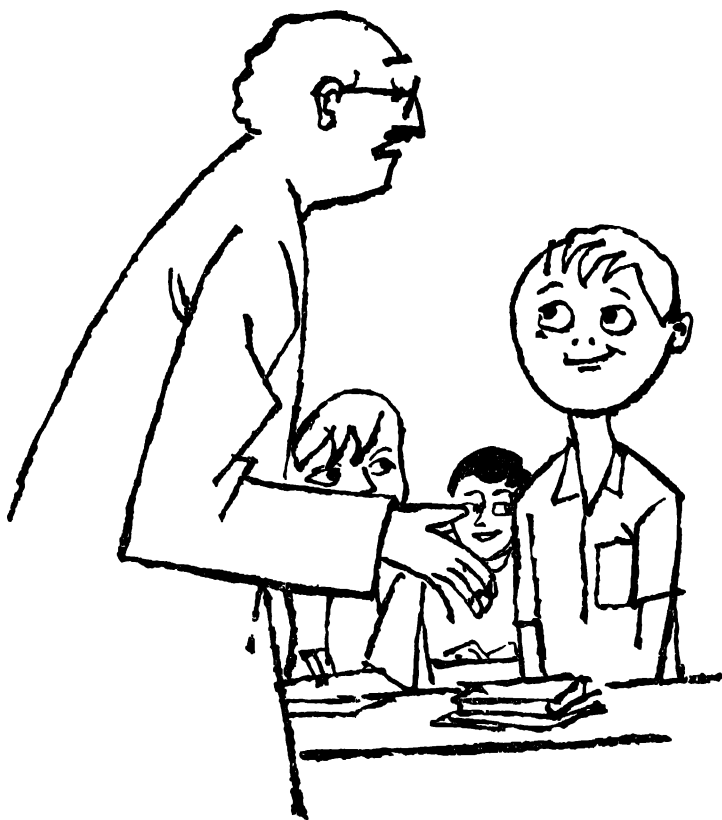
"আমি গোলক স্যার"

গোলক ?... তুমি গোলকনাথ নও—তুমি গোলোকনাথ, গোলোক হচ্ছে বিষ্ণুলোক। গোলক আর লিখো না।

তারপর মুরারি, তুমি নামের বানান কি কর ?

মুরারি—মু-রা-রী।

আমি—তবে তোমার নামের কোনও মানে হয় না। মুরারি হলে অবশ্য মানে হয়, তুমি মানে জান ?

মুরারি—মুরারি মানে বিষ্ণু।

আমি—কি করে হ'লো তা বোধহয় জান না। জানলে মুরারী লিখতে না। মুর নামক দানবের অরি অর্থাৎ শত্রু বলে বিষ্ণুর একটা নাম মুরারি।

মুরারি—আমাদের বাড়ীর কাছে মুরের নামে এভিনিউ আছে।

আমি—তা কি মুর দৈত্যের নামে? তা হলো মুর সাহেবের নামে।

তারপর জিতেন্দ্র, তোমার নামের মানে কি ?

জিতেন—জিত মানে জয়ী—জয়ীদের ইন্দ্র।

আমি—জিত মানে জয়ী নয়, পরাজিত। এটা বহুব্রীহি সমাস। ইন্দ্র জিত (পরাজিত) যাহার দ্বারা—অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ।

জিতেন্দ্র—তা হলে আমার নামটা এক রাক্ষসের !

আমি—রাক্ষসই ছিলেন তিনি, কিন্তু মাইকেল তাকে রাক্ষস রাখেননি—তাকে মহামানব করে তুলেছেন।

তারপর সৌরীন্দ্র, তুমি সৌরীন্দ্র—না শৌরীন্দ্র ?

সৌরীন্দ্র—দুই-ই লিখি—যখন যা হাতে এসে পড়ে।

আমি—ঠিকই কর। দুই-ই চলতে পারে। মানের একটু তফাৎ আছে। ইন্দ্রটাতো দুয়েতেই আছে—সৌরির চেয়ে শৌরিই ভালো, কারণ, সূর (সূর্য)—অপত্যার্থে ষ্ণি—সৌরি,—যম কিংবা শনি। আর শূর + ষ্ণি—শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ। (শূরের পুত্র বসুদেব, বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ)। এখন 'স' লিখবে কি 'শ', ঠিক কর।

শৌরীন—এখন মানে বুঝলাম শ-ই লিখব, স্যার।

নন্দলাল—আমার নামে 'লাল' কেন স্যার? রাঙা নন্দ সে আবার কি ?

আমি—লাল হিন্দী শব্দ—লাল হচ্ছে তুলাল, আদরের ছেলে। নন্দের আদরের ছেলে গোপাল।

নন্দ—রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, মোহিত-লাল—এঁরা সবাই আদরের তুলাল?

আমি—হাঁ—দেবী সরস্বতীর আদরের তুলাল এঁরা।

এইবার অশ্বিনীকুমার সেন, তোমার নামটি খুব ভালো। অশ্বিনীকুমারও 'সৌরি'।

অশ্বিনী—স্যার, আমাকে অশ্বশাবক বলে এরা ক্ষেপায়—আপনি নামের অর্থ টা এদের বুঝিয়ে দেন।

আমি—অশ্বিনীকুমার হলেন স্বর্গ-বৈদ্য—তুমিও বৈদ্যবংশীয়। অশ্বিনী (অশ্বা)—রূপা 'সংজ্ঞার' গর্ভে সূর্যের তুই যমজ পুত্র হয়—তাদের নাম রেবন্ত ও অশ্বিন্, তুই ভাই-ই অশ্বিনীকুমার। দেবসমাজে এঁদের আভিজাত্য খুব বেশী।

মধু—সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপে কি তুইটি ডিম্ব প্রসব করেন—না—এক ডিম্বেই তুই ভাই-ই ছিলেন? অরুণ ও গরুড় তুইটি পৃথক ডিম্বে জন্মেছিলেন কিন্তু।

আমি—সে কি—কশ্যপ-পত্নী বিনতা তুইটি ডিম্ব প্রসব করেছিলেন বলে অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞাও ডিম্ব প্রসব করতে যাবেন কেন? তোমার প্রগল্‌ভতা মার্জনীয় নয়।

নাঃ, আর চলবে না নামের ব্যাখ্যা। আজকার মতো থামলাম।

সেপ্টেম্বরের শেষে।

অমৃতবাবু—আসুন বেহাই মশায়,আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সুসংবাদ আছে। নীহার তার মাকে লিখেছে—"রেবা বি-এ পাশ করেছে শুনে সুখী হ'লাম। হিষ্ট্রিতে অনার্স পেয়েছে, এম-এ তাতেই পড়বে নিশ্চয়। আমি নভেম্বরের শেষে যাব—যাওয়ার পর অন্য কথা হবে।" তা হ'লে আপনি প্রস্তুত হোন। আব আমার সেই কথাটা।

অজয়বাবু—হাঁ, হাঁ, তা দেব নভেম্বর মাসেই। নভেম্বরের গোড়াতেই টাকাটা ডিউ হবে ব্যাঙ্কে।

অমৃত—তেতলায় বাথরুমসহ একখানা ঘর বাড়াচ্ছি।—একখানা আছে, ত্বখানা না হ'লে ওদেব স্থবিধে হবে না, তাই—বুঝলেন কিনা। আপনি একেবারে তৈরী ছেলে পেয়ে গেলেন।

অমৃতবাবুব দাদা—অমৃত, অজয়বাবুর কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ঘর বাড়ানোর আইডিয়াই আমাব ভাল লাগছে না।

অজয়—তাতে কি হয়েছে? দিতেই তো হবে ত্বদিন আগে আর পিছে। তিন বছর থেকে সম্বন্ধ হয়ে রয়েছে। বাবাজী বিলাত না গেলে এতদিন শুভকর্ম কোন্‌দিন হ'য়ে যেত। এতদিনে আমরা নাতির মুখ দেখতাম।

অমৃত—বেহাই মশায়, বেয়ান ঠাকরুনকে একদিন পাঠিয়ে দিন—ত্ব'সেট ক'রে গহনার তালিকাটা বৌঠান আব আপনার বেয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ঠিক করে যান।

দাদা—গহনা তো সাতদিনেই হতে পারে—নীহার আগে আসুক।

অজয়বাবু—না না দাদা, সময় থাকতে প্রস্তুত হওয়াই ভালো। নীহারকে তো জানানোই হয়েছে, আসার পর দশদিনের মধ্যেই

বিবাহ দেওয়া হবে। তার নিজেরই পছন্দ করা মেয়ে। বোধ হয় ওদের মধ্যে চিঠিপত্রও চলছে।

নভেম্বরের গোড়ায়—

অজয়—আমি কিছু কিছু জিনিস কিনে ফেললাম, গহনা তৈরিও প্রায় শেষ হয়ে এলো। বন্ধুর রুচিমত জিনিস আমার ছেলে নিখিলই সব কিনছে।

দাদা—কি কি কিনলেন ?

অজয়—এই বিশেষ কিছু নয় রেফ্রিজারেটার, খাট-বিছানা, রেডিও, সোফা কোচ, আয়না, আলমারি—বই-ভর্তি রিভলভিং বুক-কেস, তিন-চাররকম টেবিল, বারোখানা নানা ধরণের চেয়ার, কতকগুলো ভালো পর্দা, বড় ক্লক—

অমৃত—ওয়াচটা কিনবেন না বেয়াই মশাই, সে নিজে পছন্দ করে কিনবে।

অজয়—ঘড়ি, আঙটি ইত্যাদি কিনিনি তবে হীরের বোতাম সেটটা কিনে ফেলেছি।—গায়ের মাপ পেলে তাব স্যুটগুলো তৈরি কবাতাম।

অমৃত—পুরানো শার্ট, কোট, প্যাণ্ট, জুতো সবইতো রয়েছে—মাপ নিলেই হয়।

দাদা—না না,—দু'বছরে শরীরের কি পরিবর্তন হয়েছে ঠিক নেই—ওসব থাক।

অজয়—কন্যা আশীর্বাদটা করলে হ'তো না ?

দাদা—না না, আগে পাত্র আশীর্বাদ না হলে কন্যা আশীর্বাদ হবে কি করে ?

অজয়—টাকাটা আজো আনা হল না, শিগ্‌গির পাঠিযে দেব।

অমৃত—দু-এক দিনের মধ্যে পেলে ভালো হ'ত বেয়াই মশায়। এমনিই খুব দেরী হয়ে গেল।—ভালো কথা, কোষ্ঠীতে একেবারে রাজযোটক। আপনার কন্যাটি খুবই ভাগ্যবতী।

দাদা—ভাগ্যবতী তো নিশ্চয় তা না হলে অজয়ের মতো বাপের মেয়ে হয়ে জন্মায়।

নভেম্বরের শেষাশেষি—

অজয়—নীহার কবে আসছে তা লিখেছে?

অমৃত—তারিখ তো কিছু লেখেনি—এই সপ্তাহেই আসবে। বিলাত থেকে বেরিয়েছে—একবার ইটালীটা ঘুরে আসছে।

দাদা—ইটালী তো দুবার গিয়েছে—আবার ইটালী কেন বুঝতে পারছি না।

অজয়—পণের টাকার প্রায় অর্ধেকটা আড়াই হাজার আজ এনেছি।

দাদা—পৌষ মাসে তো বিয়ে হচ্ছে না—এত আগে থেকে ওটা দেওয়ার দরকার কি?

অমৃত—দরকার তো আছেই, দাদা। রাজমিস্ত্রীদের দেনা মেটাতে হবে—অন্য খরচও আছে। বাড়ীটাব চূণকাম করাতে হবে, জানলা দরজায় রঙ ফেরাতে হবে। এনেছেন যখন তখন দিয়েই যান।

অজয়—আমার একটা নিবেদন ছিল বেয়াই মশায়,—পণের টাকার হাজার খানেক যদি মাফ করতেন!—যৌতুকের জিনিসপত্রে পাঁচ-ছয় হাজার পড়ে যাচ্ছে—তা ছাড়া গয়না আছে।

অমৃত—যৌতুকে অত ব্যয় করছেন কেন? নগদটারই খুব দরকার। আপনারই মেয়ের জন্য ঘর তৈরী হচ্ছে—মনে রাখবেন। এবিষয়ে আর দ্বিমত করবেন না—বাড়ীর ঐ একমাত্র সোনারচাঁদ ছেলে। দাদার পুত্রসন্তান নেই—একটু সাধ আহ্লাদ করতে হবে তো। আর আপনার তো ঐ একটিই মেয়ে।

অজয়—তাই হবে, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্‌পান্ন।

দাদা—বোঝার উপর শাকের আটি!

অজয়—বিয়ের দিনটা ঠিক করলে হ'ত না?

দাদা—ফিরে আসুক —তারপর দেখা যাবে। অগ্রাণে হলে বড় তাড়াতাড়ি হয়, মাঘের গোড়ায় দিন দেখতে হয়।

অজয়—আমি তো রেডি; দাদা,—যেদিন বলবেন সেইদিনই হ'তে পারে। যাই হোক—দু'একটা ছোটখাটো বিষয়ের আলোচনা করা যাক। বরযাত্রী কতগুলি হবে?

নীহার সঙ্গে একটি শাড়ী-পরা যুবতী মেম নিয়ে নামল

অমৃত—শ'খানেক, কি বলেন, দাদা!

দাদা—তা কি করে বলা যাবে?—নীহারের বন্ধু কতগুলি হবে—তাতো জানি না।

অজয়—নমস্কারী কাপড় কতগুলি দিতে হবে—তার একটা ফর্দ পেলে হ'ত।

অমৃত—তা পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, রূপোর সেট দিচ্ছেন নাকি!

অজয়—ও ইয়েস—রূপোর ফুলসেট বাসন, আর ট্রে-সহ টি-সেট, ফুলদানি। একটা কথা সংকোচের সঙ্গে বলছি—রেবা এতবেশি উপহার পাবে যে আপনার ঘরে তা ধরবে না। সে অন্ততঃ একশো-খানা শাড়ীই নিয়ে আসবে। কাজেই এ সব সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের প্রয়োজন নেই।

অমৃত—ভালো ভালো। আপনার একটিই মেয়ে, বিলাত-ফেরতা সোনার চাঁদ জামাই, দেবেনই তো। আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা। খাওয়া দাওয়ার আয়োজনে বাড়াবাড়ি করবেন না—মাংসটা করবেন, কিন্তু চপ, কাটলেটের—

বাধা পড়ল। একখানা ট্যাক্সি এসে দুয়ারে থামল। নীহার, সঙ্গে একটি শাড়ী-পরা যুবতী মেম নিয়ে নামল। চাকরেরা ছুটে গিয়ে জিনিসপত্র ট্যাক্সি থেকে নামাতে লাগল। নীহার ঘরে ঢুকে ইতালী দেশীয়া নববধূকে বাপ-জ্যাঠার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দুজনে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। শাঁখ বাজাতে বাজাতে অমৃতবাবুর ভাইঝি দুজন এসে মেম সাহেবের হাত ধরে উপরে নিয়ে গেল, নীহার 'মা' 'মা' ব'লে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

একশো টাকার নোটগুলি এবং নিজের কাছা ও কোঁচা গুটিয়ে নিয়ে অজয়বাবু ট্যাক্সিতে গিয়ে চড়ে বসে বললেন—চালাও বীডন ষ্ট্রীট।

বাঙালী ড্রাইভার বললে—আমি এখনো ভাড়া পাইনি, স্যার।

অজয়বাবু বললেন—ওদের ভাড়া আমিই দেব, চল। দুইভাই স্তম্ভিত। মুখে একটি কথাও নেই। দাদা শুধু বললেন—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—অমি, বরাবর আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল। ঝি ছুটে এসে বলল—ছোট গিন্নীমার ফিট হয়েছে।

কবির বিবাহ

কিংশুক রায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে দুবছর আগে। বড় সরকারী চাকুরের আদুরে দুলাল। রোগা ছিপছিপে গড়ন, রং ফর্সা। সে কবি, তার কবিতাগুলি নব্য ও প্রাচীন ধারার মাঝামাঝি। কিংশুক প্রাইভেটে এম-এ দেবে কথা ছিল, কিন্তু সাহিত্যচর্চার সুবিধার জন্য আর্যভারতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হয়ে পড়ায় সে মতলবটা মুলতুবী আছে। কিংশুকের চাকরি বাকরির দিকে মন নেই জেনে পিতা তার ব্যবসার জন্য মূলধন সঞ্চয় করছেন। কিংশুক পকেট খরচ পায় আর্যভারতী আফিস থেকেই। তার গল্প লেখারও অভ্যাস আছে। দুই চারটা প্রবন্ধও সে লিখেছে, কিন্তু তার ভাষা এত জটিল যে তার বক্তব্য কি তা কেউ বুঝতে পারে না। কবিতাও দুর্বোধ্য।

কিংশুকের সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। এই প্রেম তার মানসী কিংবা কোন অনির্দিষ্টা মানুষীর উদ্দেশে। কিংশুকের পরম বন্ধু ছিল ময়ুখ। ময়ুখই কিংশুকের কবিতার প্রধান অনুরক্ত, উপভোক্তা, ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ও স্তাবক। বসওয়েল বললেও চলে। কিংশুকের সঙ্কল্প ছিল—সে বিবাহ করবে •'। কারণ, বিবাহে কবি জীবনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। ময়ুখ একদিন কিংশুককে বলল—"দেখ, দেহাতীত প্রেম নিয়ে লেখা কবিতাগুলো অবাস্তব হয়ে পড়ছে। কেউ কেউ বলছে—ওসব কবিতা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। এ যুগে দেহাতীত অবাস্তব প্রেমের কবিতা আর চলবে না। তোমার দরকার রক্তমাংসে জীবন্ত নারীদেহকে আশ্রয় করে প্রেম কবিতা রচনা করা।" একথা শুনে কিংশুক চমকে উঠল—হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে সে যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। সে ভাবল—কথাটা ময়ুখ ঠিকই বলেছে—

এখন উপায় ? তাহলে তো বিয়ে করতে হয়। কিংশুক মহাসমস্যায় পড়ে গেল। সে বিবাহ করব না বলায় বাড়ীর লোক বিবাহের নামই করে না। যাই হোক, কিংশুকের বিবাহে সম্মতি আছে তা ময়ূখের ভগিনীর মারফতে কিংশুকের মাসীর কাছে পৌঁছুতে দেরী হল না। তখন নানা স্থান থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। কিংশুকের পিতা পাত্রীনির্বাচনে কিংশুককেই ভার দিলেন। কাব্যসাহিত্যে অনুরাগিণী কিংবা কবিতারচয়িত্রী যুবতীর সন্ধান চলতে লাগল। কিংশুক ময়ূখের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্রশ্নমালা রচনা করে নিল। এই প্রশ্নপত্র নিয়ে দুইজনে পাত্রী দেখতে যেত। ময়ূখই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করত। প্রশ্নগুলি এই—

১। বিদ্যা কত দূর ? ২। নাচ-গান জানা আছে কিনা ? ৩। আর্যভারতী পত্রিকা পড় কিনা ? ৪। কার কার কবিতা পড়তে ভাল লাগে ? ৫। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে পারো ? পাঠ্য-পুস্তকের কবিতা হলে চলবে না। ৬। কবিতা লিখতে পারো কিনা ? ৭। বাড়ীতে কার কার কবিতার বই আছে ?

যতগুলি পাত্রী কিংশুক পরীক্ষা করল তাদের মধ্যে কেউ পাস করতে পারল না। বিশেষতঃ আর্যভারতী পত্রিকার নামই কেউ শোনেনি। অধিকাংশ প্রশ্নেই পাত্রীরা নিরুত্তর। একস্থলে কিংশুক খুব অপদস্থ হয়ে গেল। একটি পাত্রী সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে। ১। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ি। ২। গান জানি—নাচ জানি না, কারণ সিনেমায় নামবার ইচ্ছে নেই। ৩। আর্যভারতী পত্রিকার নাম কদিন হলো শুনেছি, এককপিও চোখে দেখিনি। ৪। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভাল লাগে। ৫। রবীন্দ্রনাথের একটা কেন, ৭৷৮টা কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, আবৃত্তি করে তিনবার মেডাল পেয়েছি। ৬। সামান্য সামান্য কবিতা লিখতে পারি, কলেজ ম্যাগাজিনে বেরোয়। ৭। বাড়ীতে সব বড় বড় কবিরই কবিতার বই আছে—কতকগুলো প্রাইজও পেয়েছি।

কাল বৈকালে কিংশুকবাবুর 'সুদুর্লভা' ও 'স্বপ্ন সহচরী' দাদা কিনে এনে দিয়েছেন।

কিংশুক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ময়ূখ বলল—আপনার উত্তরে আমরা খুশী হলাম। কিংশুক ময়ূখের কানে কানে কি যেন বলল। ময়ূখ জিজ্ঞাসা করল—'সুদুর্লভা' ও 'স্বপ্ন সহচরী' পড়ে কেমন লাগল?

পাত্রী—পড়ে কিছু বুঝতে পারলাম না—রবীন্দ্রনাথের লেখার মতো সহজ লেখা নয়।

ময়ূখ—আমরা তবে এখন উঠি।

পাত্রী—আমার যে কতকগুলো প্রশ্ন ছিল।

ময়ূখ—বলুন?

পাত্রী—আপনার বন্ধু কি স্পোর্টস জানেন?

ময়ূখ—কবি আবার স্পোর্টসম্যান হয় না কি?

পাত্রী—আমি যদি একটা গান গাই তাহলে উনি রাগিণীটা কি তা বলতে পারবেন?

ময়ূখ—তা পারবেন না বোধ হয়।

পাত্রী—উনি কি জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন ছাড়া অন্য কোন কবিতা আবৃত্তি করতে পারবেন?

ময়ূখ—তা পারবেন না; পরের কবিতা উনি মুখস্থ করেন না—নিজের সব কবিতা ওঁর মুখস্থ।

পাত্রী—উনি কিসে অনার্স, কোন্ ক্লাস?

ময়ূখ—ইংরাজিতে সেকেণ্ড ক্লাস।

পাত্রী—উনি ইংরাজিতে এম-এ পড়লেন না কেন?

ময়ূখ—প্রাইভেটে এম-এ দেবেন।

পাত্রী—বাংলায় এম-এ প্রাইভেট চলে, ইংরাজিতে সুবিধা হবে না। ওঁর ভবিষ্যৎ জীবিকা কি হবে?

ময়ূখ—এখনো স্থির হয়নি—তবে সত্বর উনি আর্যভারতীর মালিক

হবেন—তখন ওঁর পিতা পত্রিকাখানার উন্নতির জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন।

আপনাব বন্ধু কি স্পোর্টস জানেন ?

পথে যেতে যেতে কিংশুক বললে—এই পাত্রীটি বেশ সুট করবে।

চোখে মুখে কী বুদ্ধির দীপ্তি! কী সপ্রতিভতা! বেশ গুণবতী! দেখতেও মন্দ নয়। ময়ূখ ঝেঁকে উঠে বলল—"দূর! দূর!! একটা নির্লজ্জ জ্যাঠা মেয়ে! রংটাও ফর্সা নয়। প্রশ্নগুলোর অর্থ বুঝলে না? নাচের কথা হয়েছে বলে স্পোর্টসের কথা তুলে গঞ্জনা দিলে। যে গান শুনে রাগিণী বলতে পারে না—সে গানের মর্যাদা কি বোঝে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হয়েছিল বলে জীবনানন্দের কবিতার কথা তুলল। প্রত্যেক প্রশ্নের গূঢ় অর্থ আছে। তোমাকে কথায় কথায় আঘাত করলে। কিংশুক কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক—ঐ মেয়েটির বাড়ীতে পাত্র পক্ষের সম্মতি গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ বিবাহে রাজী হয়নি। এখানেই প্রথম পর্বের শেষ।

আর্যভারতীতে অনেক অনূঢ়া কিশোরী ও যুবতী ছাপাবার জন্য কবিতা পাঠাত। তাদের কবিতাগুলি সংশোধন করে কিংশুক আর্য-ভারতীতে ছাপতে সুরু করল। ক্রমে চারজন কবিতা লেখিকার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। কিংশুক তাদের সাক্ষাতেই তাদের কবিতা সংশোধন করে দিত। এদের একজনের নাম শুভা। কিংশুক একদিন তাকে বলল—"দেখ, দীর্ঘকাল তোমার কবিতা সংশোধন করবার সুযোগ পেলে তুমি রাধারাণী দেবীর চেয়ে বড় কবি হতে পারো! কিন্তু তোমাকে এর পর আর পাবো কোথায়? তুমি হয়ত কোনদিন এক অকবি অরসিকের জীবনসঙ্গিনী হবে। কোন কবির জীবনসঙ্গিনী হলে তোমার জীবন সার্থক হতো।" এর পর সেই বুদ্ধিমতী মেয়েটি আর্যভারতীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করল। পরে শোনা গেল এক কাঠখোট্টা ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ার অভিভাবকের কাছে ময়ূখের মারফতে প্রস্তাব গিয়েছিল। তিনি কিংশুক কবি একথা শুনে বলেছিলেন—"দূর! দূর! যে কবিতা লেখে তার সঙ্গে কোন প্রকৃতিস্থ বাপ মেয়ের বিয়ে দেয়? তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে···ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তৃতীয়ার পিতার কাছেও প্রস্তাব গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন —"ওরূপ পাত্র পেলে আমি ধন্য হতাম, আমি যদিও গরীব মানুষ তবুও অসবর্ণ বিবাহ দিতে পারব না।"

চতুর্থীর কাছে কিংশুক সরাসরি নিজেই প্রস্তাব করে বলেছিল— এসো না আমরা দুজনে আর্যভারতীর সেবা করে একে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় দাঁড় করাই। সে বলেছিল—আমার সঙ্গে যার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করা আছে সে দুমাস পরেই বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করে ফিরে আসছে। আমি আপনার কবিতার ভক্ত, আপনাকে চিরদিন গুরুর মত ভক্তি করব। আমি "প্রিয়া শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—হয়েই থাকব এর বেশী কিছু সম্ভাবনা নেই।"

একজন শিক্ষয়িত্রী জলপাইগুড়ি থেকে আর্যভারতীতে লেখা পাঠাতেন—তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর সঙ্গে কিংশুক পত্র বিনিময় করত—একবার পত্রে কিংশুক লিখেছিল—"বরারোহাসু" ; পত্রের ভাষা এত কবিত্বময় যে তা প্রায় প্রেম নিবেদনেরই মতো। তিনি লিখেছিলেন—খট্বারূঢ়েষু—আপনি সংস্কৃত জানেন না—সংস্কৃত পুস্তকে বাংলা অনুবাদে বরারোহা, পৃথুজঘনা, তুঙ্গস্তনী, ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা, কৃশোদরী, রম্ভোরূ, করভোরূ, গজেন্দ্রগমনা ইত্যাদি নারীর অনেক বিশেষণ পাবেন। কদাচ ঐ শব্দগুলি কোন ভদ্রমহিলার উদ্দেশে প্রয়োগ করবেন না। সংস্কৃত অভিধান দেখবেন। খট্বারূঢ় কথাটারও অর্থ দেখবেন।

আর একজন লেখিকার সঙ্গে কিংশুকের পত্র বিনিময় চলত— তাতে কাব্যালাপ প্রেমালাপের গা ঘেঁসেই চলত। কিংশুক তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল—সে লিখেছিল—"সত্যই আপনি কবি, আমাকে না দেখেই যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আমি ধন্য হলাম। আমি দেখতে কুৎসিত, চিররুগ্ন—তা ছাড়া আমি আবাল্য খঞ্জ। এ জন্যই আমার বিবাহ হয়নি।"

এইখানেই দ্বিতীয় পর্ব শেষ।

এবার অমৃতবাজারে ময়ুখ বিজ্ঞাপন দিল—একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীব একমাত্র পুত্র সুদর্শন, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, সুসাহিত্যিক পত্রিকাসম্পাদকের জন্য উচ্চ বর্ণের ও অশ্যামবর্ণের শিক্ষিতা, সাহিত্যসেবিকা কাব্যানুরাগিণী পাত্রী চাই। বয়স, বিদ্যা, উচ্চতা ও ওজন কত জানাইতে হইবে। পাশপোর্ট সাইজ ফটোসহ আবেদন করুন, বক্স নং······। ত্রিশখানি আবেদনপত্রের মধ্যে ৫।৬ জনকে ইণ্টারভিউ দিতে লেখা হল। আর্যভারতী আফিসে সকাল বেলায় ইণ্টারভিউ নেওয়া হল। একজন প্রার্থিনীর ভ্রাতা প্রথমে এলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি সাহিত্যিক, আপনার কোন উপন্যাস পুরস্কার পেয়েছে? কতগুলি উপন্যাস লিখেছেন?"

ময়ুখ—উনি কবি, ঔপন্যাসিক নন।

ভ্রাতা—তা তো বিজ্ঞাপনে লেখেননি। কবি? আরে রামঃ, মিছিমিছি হয়রানি। নমস্কাব।

আর একজন প্রার্থিনীর পিতা এলেন—তিনি এসেই বললেন—সংবাদ নিলাম, আপনি তো সম্পাদক নন,—আপনি সহকারী সম্পাদক।

উনি সত্বরই সম্পাদক এবং মালিক হবেন।

পিতা—এত দেনা হয়ে গেছে কাগজের যে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের একমাত্র পুত্রকে সম্পাদক ও মালিক দুই-ই হতে হবে? মিছিমিছি হয়রানি, নমস্কার মশায়।

আর একজন প্রার্থিনীব পক্ষ থেকে এসেছেন মামা। মামা এসেই বললেন—আর্যভারতী থেকে কত পান?

ময়ূখ—২৫০্ টাকা।

মামা—মাসে না বছরে?

ময়ূখ—বছরে মানে? মাসে ছাড়া আর কি?

মামা—এত মাহিনা সহঃ সম্পাদকের? তবে তো কাগজের নাভিশ্বাস উঠেছে। আর্যভারতীর ব্যাঙ্কের পাশ বুকটা দেখতে পারি?

ময়ূখ—তা আপনাকে দেখাবো কেন ?

মামা—দেখাবার হলে সগর্বে ড্রয়ার টেনে বার করে সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে দিতেন। যাক, কিংশুকবাবু, আপনার বি-এ পাশের সার্টিফিকেটটা একবার দেখাবেন ?

ময়ূখ—যান, যান, ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে !

মামা—আচ্ছা নমস্কার।

এবার একজন ক্ষীণাঙ্গী শিক্ষয়িত্রী এলেন। এসেই তিনি বললেন—মনোনীতা হবার জন্য আমি আসিনি। আমি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত। কিংশুকবাবু, আপনি সুশ্রী যুবক, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, পদস্থ ব্যক্তির একমাত্র সন্তান, আপনি সুপাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবাহ স্বতন্ত্র জিনিস। বিকৃতমস্তিষ্ককে কেউ বিয়ে করতে পারে না। আপনি ইংলিশে অনার্স, আপনার এম-এ পড়বার কথা, বি-এল পড়বার কথা, বিলাত যাবার কথা উচ্চতর শিক্ষার জন্য, আপনার সামনে ভবিষ্যৎ গৌরবময়, আপনার মতো সুবিধা কজনের ভাগ্যে ঘটে, পড়াশুনায় আপনি অমনোযোগীও ছিলেন না। আপনি কিনা একটা মাসিক ছত্রিকার তলে ভেকের মতো আশ্রয় নিলেন ছড়া পাঁচালীর মক-মকানির দোহাই দিয়ে। যান এম-এ ক্লাসে ভর্তি হোন গিয়ে।

ময়ূখ—অসহ্য ! অসহ্য !! যান যান অযাচিত উপদেশ দিতে আপনাকে ডাকা হয়নি।

শিক্ষয়িত্রী—আর একটা কথা। কিংশুকবাবু, কবিতা লেখা ছেড়ে দেন আর এই বন্ধুটিকে ছাড়ুন।

এই বলেই শিক্ষয়িত্রী বিদায় নিলেন।

আর একজন পীনাঙ্গী শিক্ষয়িত্রী এলেন। তিনি বললেন—আমিও ২৫০৲ মাহিনা পাই। মনোনীতা হলেও কিন্তু চাকরি ছাড়ব না।

কিংশুক—না, তা ছাড়তে হবে না।

পীনাঙ্গী—একটা মুশকিল আছে—আমিও কিন্তু কবিতা লিখি।

কিংশুক—বেশ তো, আমি তো তাই চাচ্ছিলাম। তাহলে তো সোনায় সোহাগা!

পীনাঙ্গী—আমি কবিতা লেখা ছাড়ব না, আপনাকেই কবিতা লেখা ছাড়তে হবে।

কিংশুক—তা কেন?

পীনাঙ্গী—তুজনেই কবি হলে সংসার চলে না। একজনের অন্ততঃ প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। নইলে ছন্দে ছন্দে দ্বন্দ্ব বাধবে। ইস্পাতে ও চকমকিতে সংঘর্ষ হলে শোলায় আগুন ধরে, পুং কবিতে স্ত্রী কবিতে দ্বন্দ্ব হলে সংসারে আগুন ধরে। আপনার যা যা নেই, তাই তাই যার আছে—তারই সঙ্গে আপনার বিবাহ হওয়া উচিত। আপনি তো হাফম্যান। পূর্ণ মানুষ হতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। দেখুন বিধাতা পরিপূর্ণ মিলনের জন্য নারীকে পুরুষের সাপ্লিমেণ্টারী করে সৃষ্টি করেছেন। তুই-এর মধ্যে সাম্য যত অল্প থাকবে মিলন তত সার্থক হবে। তুই চরিত্রে Dove-tailed না হলে মিলন দৃঢ় হয় না।

কিংশুক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। ময়ূখ বিরক্ত হয়ে পীনাঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল—কী আবদার! এত বড় কবি সে কবিতা লেখা ছেড়ে দেবে আর আপনি ছাই ভস্ম কি লেখেন তাই লিখতে থাকবেন—যান, যান, খুব বিদ্যে জাহির হয়েছে। ময়ূখ কিছুই জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেল না—যারা এলো তারাই প্রশ্নও করল—তু কথা শুনিয়েও দিয়ে গেল। এইখানে তৃতীয় পর্ব শেষ।

তারপর চার বৎসর কেটে গেল—কিংশুক আর বিয়ের চেষ্টা করেনি। আজকাল সে গল্প লেখে। কবিতা ছাড়েনি। তার পিতার মৃত্যু হয়েছে—অনেক টাকা তিনি রেখে গেছেন—কিংশুক এম-এ ও বি-এল ক্লাসে ভর্তি হয়ে এবার এ.'-^ পরীক্ষা দিয়েছে—একটা সেকেণ্ড ক্লাসের প্রত্যাশা করে। একদিন সে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করে ময়ূখকে শোনালো—

সঙ্গতিপন্ন সংসারের একটি এম-এ পাশ করা যুবকের জন্য ব্রাহ্মণ

জাতির একটি পাত্রী চাই—গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেই চলবে। কিন্তু স্বাস্থ্য হওয়া চাই নিখুঁত নিটোল, মুখশ্রী যতদূর সম্ভব ভালো হওয়া চাই, আর চাই সর্ববিধ গৃহকর্মে অসাধারণ দক্ষতা। কিছু লেখাপড়া জানা চাই, উচ্চ শিক্ষিতা হবার প্রয়োজন নেই, তবে হাতের লেখা হবে পরিচ্ছন্ন। কোন পণ যৌতুকের দাবি নেই।

ময়ুখ বললে—এর মানে ?

কিংশুক—সেই পীনাঙ্গী মহিলাটির উপদেশ স্মরণ করো। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চাই। নিজের যা আছে তাকে দ্বিগুণিত করে লাভ নেই—আমার যা যা নেই তাই তাই যার আছে এমনি নারীকেই দরকার।

ময়ূখ—তোমার প্রেমের কবিতা লেখার কি হবে ?

কিংশুক—কেন রক্তমাংসে বলীয়সী নারীইতো চাই প্রেমের কবিতার জন্য, ডলী নিয়ে কবিতা লেখা চলে না—খেলা চলতে পারে। আমি যা পাবি না, তাকে তাই করতে দেখব আর তাকে রহস্যময়ী মনে হবে—বিস্ময় জাগবে, বিস্ময়ই কবিতার প্রাণ—শ্রদ্ধা জাগবে—শ্রদ্ধাই তো প্রেম।

ময়ূখ—তোমার কবিতা তো সে বুঝবে না।

কিংশুক—সে যা বুঝবে তাইতো কবিতা। সে যা বুঝবে না—তা কবিতা নয়, বিদ্যার কচ-কচি মাত্র, হেঁয়ালী, প্রহেলিকা, কুহেলিকা। তার রসবোধই হবে আমার কবিতার কষ্টিপাথর। হাতের লেখাটা—পরিচ্ছন্ন চাইলাম। কারণ, আমার সব লেখা সে নকল করবে।

*   *   *   *

এম-এ'র ফল বেরোনোর পর বিজ্ঞাপন বার হলো। এক মাসের মধ্যে দীর্ঘাকায়া সন্তরণপটীয়সী বলিষ্ঠা, ম্যাট্রিক পাস-করা উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের একটি যুবতীর সঙ্গে কিংশুকের বিবাহ হয়ে গেল। বধূর নাম বেলা, কিংশুকে সৌরভ ছিল না, বেলা দেবী সৌরভ নিয়ে এলে কিংশুকের সকল কবিতা সহজবোধ্য সরস ও সুরভি হয়ে উঠল।

মোটর

ইস্কুলের ছেলেদের কোন একটি বিষয়ে রচনা লেখাতে হলে একটা নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। সে পদ্ধতিটি এই—ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে একটি করে কিংবা একাধিক তথ্য সরবরাহ করবে। তার পর সবগুলি মিলিয়ে একটি সংপূর্ণাঙ্গ রচনা লিখতে হবে। একদিন দশম শ্রেণীতে মোটর সম্বন্ধে রচনা লিখবার জন্য বলা হ'ল—মোটর চালু হওয়ায় কি কি সুবিধা হয়েছে—সে সম্বন্ধে তোমরা প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি করে পয়েণ্ট যোগাও। প্রথমেই ক— উঠল। সে গত পরীক্ষায় পাস করেনি—সে বলল—মোটর থাকলে ৯-৪৫ মিনিটের সময় বেরিয়ে ঠিক সময়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছানো যায়। তাতে আধ ঘণ্টা আরো সময় পাওয়া যায় পড়বার। যে যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে শোনা যায়—সেগুলোর উত্তর ঐসময়ে দেখে নেওয়া যায়। মোটরে বসেও পড়া যায়, মোটরে বইখানা রাখা চলে, মোটরেই টিফিন খাওয়া চলে—

খ বলল—দূর। এই কি Essay-এর point হলো? বল, বাস-ট্রামের ভিড়ের ঠাসাঠাসিতে দলিত মর্দিত হয়ে ঘামে ভিজে হলে ঢুকতে হয় না।

গ বলল—মোটর হচ্ছে ডাকাতদের যানবাহন। ডাকাতি করে তাড়াতাড়ি পালাবার বেশ সুবিধা হয়।

ঘ বলে—ডাকাতের কিসে সুবিধা হয়, তাই আবার রচনায় লেখে নাকি। তাছাড়া, ডাকাতরা তো ট্যাক্সী করে পালায়—

গ বলল—ডাকাতরা বুঝি মানুষ নয়? তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা কি একেবারে ফেলনা? আর ট্যাক্সী বুঝি মোটর নয়?

ঘ বলল—বরং বল, ডাক্তারের মোটর থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক রোগী দেখতে পারেন।

ঙ বলে উঠল—আর স্যারের মোটর থাকলে আরো তিনটে টিউসনী করতে পারতেন।

চ ধমক দিয়ে বলল—থাম বেয়াদব। আমি বলি মোটর থাকলে অনেক বাড়িতে বাড়ির কর্তা-গিন্নী নিজেরাই গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতে পারেন।

ছ বলল—নিমন্ত্রণ করা না হোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার সুবিধা হয়, স্যার। মোটর থাকলে বাড়িশুদ্ধ লোক ঠাসা-ঠাসি গাদাগাদি করে গাড়ি চড়ে গিয়ে ঠেসে খেয়ে শাড়ির দামটা উশুল করে আসা যায়। একদিনে তিনটা নিনন্ত্রণ থাকলে এক বাড়িতে খেয়ে বাকি দুই বাড়ি থেকে হাঁড়ি চ্যাঙাড়ি ভরতি খাবার গাড়িতে তুলে আনা যায়। পায়ে হেঁটে গেলে সে সুবিধা হয় না—চাইতেও লজ্জা করে। মোটরীদের এতে লজ্জা হবাব কথা নয়—এতো তাঁদের অনুগ্রহ—নিমন্ত্রক ধন্য হয়ে যায়।

চ বলল—তাই আবার কেউ করে নাকি ?

ছ উত্তেজিত হয়ে বলল—আমি দেখেছি—আমাদের পাড়ার—

আমি বলতে বাধ্য হ'লাম—নাম করো না। থাক ওসব কথা। এসব কিন্তু রচনার উপাদান হচ্ছে না।

জ উঠে বলল—আমি স্যার দরকারী কথা বলছি—আমরা কলকাতা থেকে বেশ একটু দূরেই বাড়ি করেছি—যে দামে কলকাতায় ৪ কাঠা জায়গা পাওয়া যায় সেই দামে এক বিঘা জায়গা পেয়েছি—তাতে বড় বাড়ি এবং বাগান দুইই হয়েছে—এ শুধু আমাদের মোটর আছে বলেই সম্ভব হয়েছে।

এইবার উঠল বুদ্ধিমান ছেলে ঝ— সে বলল—দেখুন, মোটর চড়ে গেলে সবাই খাতির করে; যার বাড়ি বা দোকানে যাওয়া যায় সে ছুটে এসে নিয়ে গিয়ে বসায়। কারো বাড়ি গেলে কল-বেল টিপে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় না। মোটর চড়ে দালালি করলে কেস বেশি পাওয়া যায়—যাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দরকার তারা

বিজ্ঞাপন বেশি পায়। যে কোন কাজে যাওয়া যায় সে কাজ সহজে হাঁসিল হয়। ধারে জিনিস কেনা যায়, দোকানী নিজ হাতে কেনা জিনিস গাড়িতে তুলে দিয়ে নমস্কার কিংবা সেলাম করে। মোটর
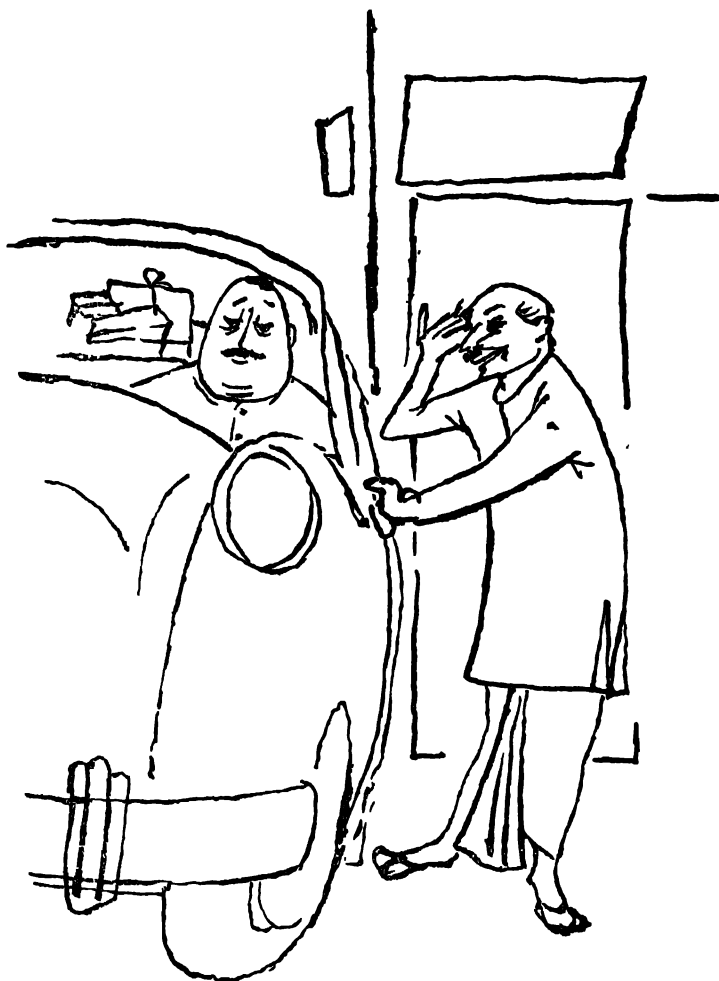
কেনা জিনিস গাড়িতে তুলে দিয়ে সেলাম করে।

চড়ে গেলে চাঁদা তো বেশি তোলা যায়ই এমন কি ভিক্ষা করতে গেলেও প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায়। সব থেকে সুবিধে হয় মেয়ের বিয়ের

পাত্র সন্ধানে। মোটর চড়ে গিয়ে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করলে সে প্রস্তাব উপেক্ষিত হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে এক কথায় উত্তর শোনা যায়—ছেলে এত অল্প বয়সে এখন বিয়ে করতে চায় না, এই তো মোটে ৩৩ বছর বয়স। তাছাড়া মহাযানীরা যে সময়ের মধ্যে দশটা বাড়িতে বর-তল্লাসী করতে পারেন, হীনযানীরা সে সময়ে ২।৩ বাড়ির বেশি যেতে পারবেন না। আর একটা সুবিধার কথা বলব না—স্যার রাগ করবেন হয়তো!

ঞ একটি পাবলিশারের ছেলে। সে বলে উঠল—ও বলতে চায়—ইস্কুলে বই ধরাতে গেলে সহজেই বই ধরে, স্যার! আমরা ঐ জন্যে মোটর রেখেছি। মোটরে করে স্পেসিমেন কাপির প্যাকেটগুলো নিয়ে যাওয়ারও সুবিধা হয়। একদিনে ১৫টা ইস্কুল ঘোরা যায়।

ট বলল—মোটর থাকলে ঠিক ৩।৪ মিনিট আগে ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে পৌঁছানো যায়। আগে থেকে গিয়ে বসে বসে ঘামতে হয় না।

ঠ বলল—ট্রেনে যে ভিড় তাতে ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় গেলে জায়গা পাওয়া যায় না কি? খুব বললি!

ট রেগে বলল—যাদের মোটর থাকে তারা থার্ড ক্লাসে যায় নাকি?

ঠ আত্মসমর্থনের জন্য বলল—আজকাল ফার্স্ট ক্লাসেও দুর্দান্ত ভিড়। কখনো ফার্স্ট ক্লাসে যাসনি জানবি কি করে?

আমি স্যার ক'টা খুব ভালো পয়েণ্ট বলছি—মোটর থাকলে গড়ের মাঠে খেলা দেখা, সিনেমা থিয়েটার দেখার সুবিধে হয়—বর্ষাকালেও। মালপত্র, ডেকচি, গামলা ইত্যাদি নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে পিকনিক করতে যাওয়ার সুবিধে হয়। কলকাতা থেকে দূরে বাগান থাকলে আনাজ তরকারী ফলমূল আনবার সুবিধে হয়। মাঝরাতে হঠাৎ জরুরী কোন দরকার হলে—যেমন হাসপাতালে পাঠানোর দরকারে

মোটর থাকলে সুবিধে হয়—দিনের বেলাতেও সব সময় ট্যাক্সী পাওয়া যায় না। ট্রামে ধর্মঘট হলে আফিস আদালত যাওয়ার কোন অসুবিধা ঘটে না—ঘরের মোটর থাকলে পরের মোটরে চড়ে বিয়ে করতে যেতে হয় না। যেমনই হোক বরের জন্য মোটর চাই-ই। রিক্স ক'রে কেউ বিয়ে করতে যায় না। মোটর থাকলে বিয়ের পর মেয়েরা ঘন ঘন বাপের বাড়িতে আসা যাওয়া করতে পারে। বাপের বাড়ির জন্য তাদের মন কেমন করে না।

ড বলল—যত সব বাজে কথা। সব থেকে বড় কথা—কলকাতায় বোমা পড়লে ট্রেনে ওঠা যায় না—মোটর থাকলে তাড়াতাড়ি পালানো যায়।

ঢ বলল—দূর! কলকাতায় কবে বোমা পড়েছিল তখন তুই জন্মাসও নি। তখন কে পালিয়েছিল কিসে চড়ে তাই আবার একটা রচনার পয়েন্ট হয় নাকি।

ড উত্তর দিল—আমি জন্মাইনি বটে, তবে বাবার কাছে শুনেছি আড়াইশো টাকা মোটর ভাড়া দিয়ে বাবা মা দাদা-দিদিদের নিয়ে হাজারিবাগে পালিয়েছিলেন—

ঢ বলল—রাখ যত বাজে কথা। আমি দামী কথা বলছি—কণ্ট্রাক্টার, ডাক্তার, দালাল ইত্যাদির মোটর খুব দরকার, উকিল ব্যারিস্টারের দরকার কম নয়, সবচেয়ে বেশি দরকার বিচারক ও আফিসের বড় কর্তার। ব্যারিস্টাররা বিলাত গিয়ে আধা সাহেব হয়ে আসেন—তাঁদের মোটর না থাকলে আভিজাত্যও থাকে না—মক্কেলের কাছে ইজ্জত বজায় থাকে না। যাদের মামলার বিচার করতে হবে তাদের সঙ্গে এক বাসে যদি বিচারক আদালতে যাওয়া আসা করেন, তবে তাঁর এজলাসের মর্যাদা থাকে না। আফিসের বড় কর্তা যদি তাঁরই আফিসের পিওন, চাপরাসী, ছোট ছোট কেরানীর সঙ্গে এক বাসে যাতায়াত করেন—তাহলে কর্তার পক্ষে আফিস শাসনে রাখার অসুবিধা হয়। ধরুন—আফিসের পিওন বাসে আগে

উঠে সীট পেয়েছে—অফিসার পরে উঠে ঠাসাঠাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে চলেছেন—

ট বলল—কেন? পিওনটা তাড়াতাড়ি সীট ছেড়ে দেবে সেলাম ক'রে।

ড—ভিড়ের মধ্যে সীট ছেড়ে দিলেই কি তিনি পাবেন? না পিওনের দয়া করে ছেড়ে দেওয়া সীটে বসা সম্মানজনক? সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে পারে—দেখেও দেখেনি ভান ক'রে। তাছাড়া, ভিড়ের মধ্যে ট্রাম-বাসের সীট প্রায় ইন্দ্রপদের মত দামী। বাপকেও ছেলে ছেড়ে দেয় কিনা সন্দেহ। দেখতে পাও না—পিতৃতুল্যেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর হাফপ্যাণ্ট-পরা পুত্রতুল্যেরা বেশ আরামে বসে আছে। যাই হোক এঁদের মোটরেব প্রয়োজন। অধ্যাপকদের সঙ্গতি নেই। কিন্তু তাঁদের মোটর থাকলে ছেলেদেরই মঙ্গল হতো। কারণ, তাঁদের ছেলেদের শাসনে রাখার সুবিধা হতো। কিন্তু উপায় নেই।

ণ ছাত্রটি উঠে বললে—মোটর তো মহাযান। এ-মহাযান মানুষকে উদার মহান মহাজন করে তোলে। সমাজে তাঁরা আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য হতে পারেন। তাঁরা আফিস আদালত থেকে ফিরবার পথে ৪।৫টা নিমন্ত্রণ সেরে যার বাড়িতে কঠিন ব্যারাম চলছে তার বাড়ির দরজায় এক মিনিট থেমে খোঁজ নিয়ে, শোকার্ত ব্যক্তিকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে, কে ইলেকশনে জিতেছে, কে পরীক্ষায় ভাল করে পাশ করেছে, কে প্রমোশন পেয়েছে চাকরিতে—তাদের অভিনন্দন করে, গরীব আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নিয়ে পথে দু একজনকে লিফ্‌ট দিয়ে রাত ৯টার সময় বাড়ি ফিরতে পারেন। আদর্শ পুরুষ হতে হলে এর বেশি কিছু লাগে না। মোটর না থাকলে এসব সম্ভব হয় না। হীনযানীদের এরূপ সদাশয় হওয়া কল্পনাতীত। তারা অসামাজিক অশিষ্ট, অভদ্র হয়েই থেকে যায়।

আমি বললাম—হুঁ—সব শুনলাম। আচ্ছা, রঘু তুমি কিছু বলো।

রঘু বলে—স্যার, আমি পাড়াগেঁয়ে গরিবের ছেলে পরের আশ্রয়ে বিনা বেতনে পড়াশুনা করছি। আদার ব্যাপারীর কাছে জাহাজের বা মোটরের খবর কি আর পাবেন? আমি গোরুর গাড়ির সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি। জীবনে সজ্ঞানে মোটর কখন চড়িনি। প্রথম যখন কলকাতায় আসি তখন মোটরের ধাক্কা খেয়ে পড়ে অজ্ঞান অবস্থায় একজন সদাশয় লোকের মোটরে হাসপাতালে প্রেরিত হই। মোটরের সঙ্গে আমার এইটুকুই সম্পর্ক।

ণ বলল—এ-ও একটা পয়েন্ট স্যার। যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে। মোটরের ধাক্কা খেয়ে পড়ে মোটরে চড়েই হাসপাতালে যাওয়া।

আমি শেষে বললাম—দেখ তোমরা অনেক বাজে কথা বলেছ—কাজের কথাও কেউ কেউ বেশ বুদ্ধিমানের মতো বলেছ। এইগুলির মধ্যে যা যা রচনায় স্থান পাবার যোগ্য তাই নিয়ে এক রচনা লিখে আনবে। যেটা সবচেয়ে ভালো হবে—সেটাকে ইস্কুলের ম্যাগাজিনে ছেপে দেব।

অবসরের বিড়ম্বনা

পিতৃবন্ধু মিঃ ঘোষ অত্যুচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন, এখন তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। তাঁর সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা করতে গেলাম। মস্ত বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ী। বাড়ীর কি একটা ফরাসী নাম ফটকের পাশে প্রস্তরফলকে লেখা আছে। দারোয়ান আমাকে চিন্‌তে পেরে সেলাম করে উপরের সিঁড়ির পথ দেখিয়ে দিলে। নিঃশব্দে কাঠের সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে উপরে গিয়ে দেখি—একটা ইজি-চেয়ারে তিনি শুয়ে আছেন। সস্নেহে পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। মিঃ ঘোষের শরীর শুকিয়ে গেছে। যৌবনেই ধুতি চাদর ছেড়েছিলেন—আজো আর পরেননি। ঢিলে পাজামা পরে ও ঢিলে জামা গায়ে দিয়ে বসে আছেন। চেহারার আর সে চেকনাই নেই, খাঁটি বাঙ্গালী চেহারা ফিরে পেয়েছেন। জামা-পাজামা ছাড়িয়ে একখানা ময়লা ধুতি পরালে আমাদের গাঁয়ের মুদি বেহারী মোড়লের সঙ্গে চেহারার আর কোন তফাৎ থাকে না; জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন আছেন জ্যাঠা ম'শায়? আমি প্রশান্ত, অনন্ত রায়ের ছোটছেলে।"

"প্রশান্ত? এসো এসো, বসো বাবা। আর এ বয়সে ভালো কি করে থাকব? High blood pressure, বাত, অর্শ—সব এক সঙ্গে কাবু ক'রে ফেলেছে। দেখ—ছাত্রজীবনে ফুটবল আর পরে চাকরি-জীবনে টেনিস বিলিয়ার্ড পোলো খেলতাম ব'লে এখনো টিকে আছি। সব চেয়ে মুস্‌কিল কি জানো? সময় কাটে না। চব্বিশ ঘণ্টা তো ঘুমোনো যায় না, ঘুমও হয় না আর,—বুঝলে? একটু জোরে কথা বলো, কানে কম শুনছি।"

"কেন? ছেলে-মেয়ে বৌ-নাতি-নাত্‌নীতে তো বাড়ী ভরা।

তাদের সঙ্গে গল্পগুজব কথাবার্তাতেই তো আপনার সময় অক্লেশে কেটে যাবার কথা।”

“তুমি ক্ষেপেছ প্রশান্ত! ওরা সব আছে শুনি, মাঝে মাঝে ওদের কাউকে কাউকে দেখতেও পাই। কেউ এদিকে ঘেঁষে না, ঘরে ঢোকে না, কাছে বসা দূরে থাক। নাতিনাতনীরা ফিসফিস করে কি বলতে বলতে উঁকি দিয়ে পালায়। ‘কে রে’ ব’লে ডাকাডাকি করি—তার জবাব আর পাইনে। ছেলেরা সই-টই করাতে মাঝে মাঝে কাগজপত্র নিয়ে আসে, সই করে দিই। কিসে সই করছি পড়েও দেখি না। চাকর বাকরে ঘরেই খাবারটাবার নিয়ে আসে। বৌ-ঝিদের কাউকে ডেকে পাঠালে দুয়ারে দাঁড়িয়ে কথা কয়—ঘরের ভেতর ঢুকে বসে না। কাউকে বসতে বললে—বলে ‘হাতে অনেক কাজ আছে—পরে আসব।’ বুড়োকে সবাই এড়িয়ে চলে, বাবা, কেউ বুড়োর কাছে ঘেঁষতে চায় না। কানে কম শুনি বলে আর কেউ এ ঘরে আসে না। একটু নিম্ন কণ্ঠে বললেন—তোমার জ্যাঠাইমা পর্যন্ত এদিকে বড় একটা আসেন না। তিনি বেশ বৌ-ঝিদের দলে মিশে গেছেন। তা ছাড়া, তাঁর তীর্থ-ধর্ম বার-ব্রত পূজাপার্বণ লেগেই আছে। চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে আহ্নিক না কি মাথা মুণ্ডু করেন। এদিকে যখন আসেন একটা ঝোলার মধ্যে হাত পূরে মুখে বিড়বিড় ক’রে কি যেন জপেন। বিছানা থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়ান। এ সব উপসর্গ তাঁর কোন কালে ছিল না। মন্ত্র নিয়েছেন এক গুরুর কাছে। স্বামীর চেয়ে স্বামীজির আনুগত্যই তাঁর বেশি। যাক্ আমিও এদের বেশি দিন বিরক্ত করব না, বুঝলে?”

“গাড়ী ক’রে প্রত্যহ দুবেলা বেড়াতে গেলে তো পারেন।”

“গাড়ী? আমার তো গাড়ী নেই। গাড়ী অনেক দিন আগেই বিদেয় করেছি।”

“কেন ছেলেদের তো গাড়ী আছে।”

“হ্যাঁ, তা আছে। ছেলেদের প্রত্যেকের গাড়ী আছে। ড্রাইভার

আছে একটা, সে শুধু বড় ছেলের গাড়ী চালায়। বাকি ছেলেরা নিজেরাই ড্রাইভ করে। সকাল বেলায় ড্রাইভার আসে না। আসে বেলা দশটায়। বিকেল বেলায় ছেলেরা বৌমাদের ও ছেলেপুলেদের নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওদের খেলার মাঠ আছে, পার্টি আছে, সিনেমা আছে, ক্লাব আছে, বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়ী আছে, শ্বশুরবাড়ী আছে। প্রায়ই এখানে ওখানে নেমন্তন্ন থাকে। আমি গাড়ী পাই না,—চাইতে লজ্জা করে। বুঝলে?"

"আপনি তো মোটা পেন্সন পাচ্ছেন, গাড়ী একখানা রাখলেই পারেন।"

"শুধু বেড়াবার জন্য একটা গাড়ী পোষা অপব্যয় মনে করি। তা ছাড়া, পেনসনও আর মোটা নেই—অনেকটা কমিউট ক'রেছি বাড়ীখানা তৈরি করতে।"

"শুধু বেড়ানো কেন? বৈকালে সন্ধ্যায় শহরে অনেক সভাসমিতি হয়—সেগুলো attend করলে তো বেশ সময় কাটে, মনও ভালো থাকে। কুমার শরদিন্দু রায়, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় এঁরাও তো আপনারই বয়সী। এঁরা খবরের কাগজের নোটিশ দেখে প্রায় প্রত্যহই সভাসমিতি attend করেন। আপনিও তাই করতে পারেন।"

"হাঁ, সভাসমিতির কথা যদি বললে—তবে শোন। চিরদিন সভায় প্রেসিডেন্টই হয়েছি। দু'চারটা সভায় প্রিসাইড না করলেও সভাপতির পাশেই বসেছি—আমাকেও ফুলের মালা দিয়েছে।—আর আজ সভায় গিয়ে অন্য দশজনের সঙ্গে গ্যালারিতে বসব—সেটাতে প্রেস্টিজ থাকে কি ক'রে? এখন তো কেউ আমাকে Daisএ নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে না। যদি চেনা লোক থাকে তবে বসাতেও পারে—তখন আবার নতুন বিপদ—বাংলায় বক্তৃতা করতে হবে। সে তো আমার আসে না, বাপু।"

"আপনি তো অনেক সভায় সভাপতিত্ব করতেন তাতে বক্তৃতা করতে হ'ত। আপনার তো সে অভ্যাস আছে।"

"আমি যে-সব সভায় সভাপতিত্ব করতাম (এখনকার মত পৌরোহিত্য নয়) সে-সব সভার বেশির ভাগ Prize Distribution-এর, কিংবা কোন অফিসারের সংবর্ধনা বা বিদায়ের সভা। এই তিন রকমের সভার তিনটা ইংরাজি বক্তৃতা আমার মুখস্থ করা ছিল। মাঝে মাঝে অন্য সভা-টভাতেও সভাপতি হ'তে হ'ত। আমার ছেলের প্রাইভেট টিউটার একটা কিছু লিখে দিত—সেটা কোন প্রকারে পড়তাম। জানো তো, বাংলা আমি লিখতেও পারি না, বলতেও পারি না। আমাদের সময়ে স্কুলকলেজে বাংলা পড়ানো হতো না। মাষ্টার প্রোফেসারদের সঙ্গেও ইংরাজিতেই কথা বলতে হ'তো, ছেলেদের মধ্যে ইংরাজিতে তর্ক বিতর্ক করতাম। সে কালে ধর্মসভা ছাড়া বাংলায় কোন সভাও হ'ত না। আমরা ধর্মসভার ধার দিয়েও যেতাম না। পরেও আমি কখনো ভণ্ডদের ধর্মসভায় যাইনি। তা ছাড়া, আমি তো বিলাত গিয়ে সাহেবই হয়ে এসেছিলাম—কাজেই ম্লেচ্ছ ব'লে কেউ ধর্মসভায় ডাকতও না। বাবুর্চির হাতেই তো চিরদিন খেয়েছি। আজকালই না হয় চাকর বামুনের রান্না খাচ্ছি।"

"এখন কি বাবুর্চির হাতে আর খান্ না?"

"বাবুর্চির হাতে রান্না যে সব খাদ্য খেতাম—সে সব পেটে সয় না। তা ছাড়া, শাক, সুক্ত, ঘণ্ট, ঝোল, ঝাল এগুলো খেতে আজকাল বেশ লাগে। বাবুর্চির রান্নায় অরুচি ধরে গেছে। দাঁতও পড়ে গেছে কিনা, বুঝলে? আগে প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। এখন দুধ।"

"আপনার চোখের দৃষ্টিতো ঠিক আছে।"

"হাঁ, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও চশমার জোরে কোনরূপে কাজ চল্‌ছে।"

"তবে তো আপনি পড়াশুনা বেশ করতে পারেন। তবে আর সময় কাটাবার ভাবনা কি?"

"হাঁ পড়ি তো! সকালবেলায় Statesman পড়ি—এটা আমার পঞ্চাশ বছরের অভ্যেস।"

"শুধু Statesman কেন, ইংরাজি অন্যান্য কাগজ আছে—বাংলা দৈনিক কাগজ আছে।"

"খবরের কাগজ একখানা পড়লেই তো সব খবর জানা যায়। বাঙ্গালীর লেখা খবরের কাগজ পড়লে ইংরাজি ভুলে যেতে হবে—বাঙ্গালী কি আর আসল ইংরাজি লিখতে পারে? Statesman পড়েই তো সাহেবের মত ইংরাজি শিখেছি। ইংরাজি শিখবার জন্য Statesman আর Englishman পড়তাম—কখনো কখনো এন ঘোষের Indian Nation পড়তাম। এন. সেনের Indian Mirror পড়তাম বটে, কিন্তু কিসে আব কিসে!

"বাংলা দৈনিক কাগজ আজকাল বেরোয় শুনেছি। ওসব কি শিক্ষিত লোকের পাঠ্য? বিদেশী খবর, বিদেশী Politics কি বাংলায় লেখা যায়, বাপু! ওসব মেয়েদের কিংবা পাড়াগাঁয়ের লোকের জন্য।"

"না, জ্যাঠা ম'শায়, আপনি দেশী কাগজ পড়ে দেখবেন। ওসবে শুধু খবরই থাকে না, অনেক ভালো জিনিস থাকে। ওগুলোয় Statesman-এর তুলনায় দেশের খবর ঢের বেশী থাকে। Leader, Editorial Comment ইত্যাদি খুব ভালো থাকে। বাংলা ভাষায় বিদেশী রাজনীতির কথা, দুনিয়াব সবরকম খবরাখবর চমৎকার লেখা যাচ্ছে।"

"আর চমৎকার! ইংবাজের রাজত্বই গেল। Golden Ageই ফুরিয়ে গেল। সেটা ছিল Augustan Age এদেশের। বাঙ্গালীর আবার স্বাধীনতা! যেমন রাজ্য, তেমনি তার রাজনীতি—তেমনি সব কর্ণধাররা, তার তেমনি খবর। ওসব আর জান্‌তে পড়তে ইচ্ছা করে না।" এই ব'লে মিঃ ঘোষ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—বললেন, "আমরা তো ইংরাজের সুশাসনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মানে মানে কাটিয়ে দিলাম। এখন এরা ইংরাজের দেওয়া পেনসনটা বন্ধ না করলে বাঁচি। আমরা তো শান্তিতে কাটালাম—মর, তোরা এখন

মারামারি কাটাকাটি ক'রে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা—স্বাধীনতা ধুয়ে ধুয়ে জল খা।"

তারপর তিনি মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র এবং বর্তমান গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে যে সব উক্তি করলেন—তা অনুমেয়। কেবল চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে যা বললেন—তা ভবিষ্যতের অবিমৃষ্যকারীদের শিক্ষার জিনিস। বললেন—"সি. আর. দাস যখন পনেরো বিশ হাজার টাকা মাসে রোজগার করছে—তার ওপর এক একটা বড় বড় কেসে লাখ টাকা পর্যন্ত রোজগার করছে—তখন তার কি দুর্মতি হ'লো, দিলে তার প্র্যাকটিস্ ছেড়ে। বলে কিনা দেশের ডাক। দেশ উদ্ধার করতে হবে। আরে বাপু, প্র্যাক্‌টিস্ না ছেড়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার ক'রে দেশের জন্য দে না কেন? তাতে দেশের কাজ বেশী হ'তো—না—ভোট ভোট ক'রে ঘুরে বেড়ালে বেশী কাজ হ'ল? আজকাল ভোট ভোট ক'রে মারামারি সুরু হয়েছে। আমারও এক ভোট—আমার ঝাড়ুদারেরও এক ভোট। এইরূপ ভোটাভুটি ক'রে হবে গভর্নমেণ্ট! দূর!"

"মাথাগুণতি ভোট দেওয়ার প্রথা বিলাতেও তো আছে, জ্যাঠা ম'শায়। এ তো বিলেত হ'তে শেখা। সেখানেও তো চার্চহিলেরও একটা ভোট—তাঁর ঝাড়ুদারেরও এক ভোট।"

"কিসে আর কিসে? বিলাতের ঝাড়ুদাররাও আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের থেকে শিক্ষিত। দেশে শতকরা নব্বই জন মূর্খ—আশি জন নিরক্ষর। ভোট কাকে বলে জানে না—তাদের আবার ভোট! আমি নিজে কখনও ভোট দিইনি দেবও না। যা দিয়েছি ইংরেজ আমলেই দিয়েছি। হাঁ, তখন ভোটের দাম ছিল।"

"কথা হচ্ছিল সময় কাটানোর. আপনি সাহিত্যের বই পড়তে পারেন। আপনি যদি পড়েন, আমি দু'চার খানা বই পড়তে দিতে পারি।"

"সাহিত্য? ইংরাজি Poetry আর Essay অনেক পড়ে পরীক্ষা

প্যাশ করতে হয়েছে। ওসব আয়ত্ত করতে প্রাণান্ত হয়েছে আর ওসব ছুঁতে ইচ্ছে করে না। ইংরাজি নভেল প্রথম যৌবনে পড়েছিলাম—যেমন Dickens Thackeray, Marie Corellie, Mrs. Wood, Jane Austen—এই সব অথারের বই, ফরাসী লেখকদের গল্প। সে সব পড়েছিলাম ইংরাজি ভালো ক'রে শিখবার জন্য। তারপর চাকরি-জীবনে আর অবসর পেলাম না। সকালে সময় কম, শুধু খবরের কাগজ পড়েছি। বৈকালে Tennis খেলেছি—সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে Pilliard খেলেছি। তখন সিনেমা ছিল না, ফুটবল ম্যাচ এত ছিল না। যাই হোক—বই পড়বার সময় কোথায় বল? আর এখন ইংরাজি নভেল পড়ে আর কি হবে? এখন তো আর নতুন ক'রে ইংরাজি শিখতে হবে না।"

"ইংরাজি শেখার কথা বলছি না—সময় কাটানোর জন্য নভেল পড়তে পারেন তো!"

"মিথ্যা কতকগুলো আজগুবি কথা পড়তে আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া, এক একখানা বই ফুরুতে চায় না—চোখের ওপর অতটা অত্যাচার কি ভালো? তা ছাড়া পড়ে লাভ কি? ওতে আনন্দ যা হয় তাব থেকে ক্লেশ হয় বেশি।"

"বাংলা নভেল আজকাল অনেক হয়েছে—সেগুলো পড়তে কোন ক্লেশ হবে না। খুব বড়ও নয়। তা ছাড়া অজস্র ছোট গল্প বেরুচ্ছে।"

"বাংলা নভেল তো আমরা একদিন পড়েছিলাম। ফার্ষ্ট গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রের রামসীতা—না—সীতারাম, দুর্গেশনন্দিনী, বৃষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখরের উইল—"

"চন্দ্রশেখরের নয়, কৃষ্ণকান্তের উইল—"

"কেষ্টকান্তের উইল—ঐ একই কথা—একটা উইল নিয়ে মামলা মকদ্দমা। এসব বই পড়েছিলাম। তারপর রবিঠাকুরের—দেবী চৌধুরাণীর হাট—"

"দেবী চৌধুরাণীর হাট নয়, বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।"

"হাঁ, তা হবে। রমেশবাবুর রাজপুত মারাঠাদের নিয়ে লেখা বই, নাম মনে নেই—এসব পড়েছিলাম। তারপর আর পড়িনি। রমেশবাবু আই-সি-এস ছিলেন—মস্ত লোক। আই-সি-এস হয়েও বাংলা লিখেছিলেন।"

"শরৎবাবুর কোন বই পড়েননি ?"

"শরৎ চাটুয্যের নাম শুনেছি—আমাকে একেবারে সাহেব মনে করো না। আমাদের যৌবনকালে তাঁর বই-এর তো চলন হয়নি ; একবার দার্‌জিলিঙে আমার এক বন্ধুর টেবিলে একখানা বই পেয়েছিলাম—সেদিন বৃষ্টির জন্য বেরুতে না পেরে বইখানা গোটাই পড়েছিলাম, বইখানার নাম মনে নেই—এই পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের ঝগড়াঝাঁটি আর মান অভিমান, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা। মন্দ লাগেনি। আর কোন বই চোখেই পড়েনি। শুনেছি ইনি বর্মায় একটা সামান্য কেরানিগিরি করতেন। লেখা পড়া কিছু জানতেন না। রমেশবাবু কিন্তু আই-সি-এস ছিলেন। আর কি একজন ব্যারিষ্টারের একখানা গল্পের বই পড়েছিলাম, তাতে একটা বিলাতী মেয়ের কথা ছিল।"

"হাঁ, আপনি বোধ হয় প্রভাত মুখুয্যের দেশী-বিলাতী বইখানার কথা বলছেন। এখন অনেক ভালো ভালো গল্প নভেল হয়েছে, পড়েন তো এনে দিই।"

"না—না, নভেল আমার ভালো লাগে না—কেবল সব দুঃখ কষ্টের কথা, আর স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ, মৃত্যু, খুনজখম—ওসব পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়।" ফৌজদারি মামলার রিপোর্টগুলো যা সেগুলোও তাই।

"বাংলা নভেল ছাড়া অন্য সাহিত্য পড়তে পারেন।"

"অন্য সাহিত্য কি আছে পড়বার মত, বল দেখি।"

"রবীন্দ্রনাথের অনেক বই আছে।"

"হাঁ, রবিঠাকুরের লেখা নিয়ে আমাদের যৌবনকালে খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হ'ত শুনতে পেতাম। কাব্য-বিশারদ পায়রা কবি বলে কি যেন ছড়া লিখেছিল—কলেজের ছেলেদের মুখস্থ ছিল। ইউরোপে যখন তাঁর খুব নাম হয়েছে তখন নিশ্চয়ই তাঁর লেখা ভালো। তিনি তো কবি। আমরা এক সময়ে হেমচন্দ্রের বেত্রসংহারের ও নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধের কিছু কিছু অংশ পড়েছিলাম। বাংলা কাব্য আর কিছু পড়িনি। রবিঠাকুর অনেক গান লিখেছেন, রেডিওতে শুনতে পাই। আজকালকাব গান আমাব ভালো লাগে না, কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা ঢঙ, আর নাকী নাকী সুর। হাঁ, কালোয়াতি গান গাইত হরি চক্কোত্তি, আসর মাত্ ক'রে দিত। আর রাধিকে গোসাঞের গানও বেশ লাগত।"

"তিনি তো রবীন্দ্রনাথের গানই গাইতেন।"

"তাই নাকি? ভণিতা থাকৃত না তো! সে গানগুলোতো বেশ লেখা। কোন কোন সভায় রবিঠাকুরেব দু'একটা কবিতা আব্রিত্তি করতে শুনেছি। সেগুলো মোটামুটি বুঝেছি। কিন্তু একখানা কবিতার বই আমার নাতনী অমলাব বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য আছে সেখানা সেদিন একটু পড়ছিলাম—কিছুই বুঝতে পারলাম না। বি. এ. পরীক্ষায় আবার বাংলা বই! কালে কালে কতই দেখব। তোমাদের রবিবাবু এত শক্ত শক্ত হেঁয়ালি লিখেছেন যে বুঝবার যো নেই। হেমচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মত সোজা অথচ খুব উঁচু দরের লেখা কি এঁর আছে? মাইকেলের মত জোরালো ভাষা কি ওঁব আছে?"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা না পড়েন—তাঁর প্রবন্ধ পড়তে পারেন। প্রবন্ধের অনেক বই আছে। নাটক অনেক আছে।"

"প্রবন্ধ কি? Essay তো? সেগুলো কি নিয়ে লেখা বলতো?"

"এই—সমাজতত্ত্ব, সাহিত্যের রসবিচার, সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়, ধর্ম—এই সব বিষয় নিয়ে লেখা। খুব ভাবগর্ভ রচনা।"

"তাই নাকি? Essay লিখতে তো বিদ্যের দরকার হয়, প্রশান্ত! রবিঠাকুরের বিদ্যেটা কি? এন্‌ট্রান্সও তো পাশ করেননি—বাংলা

স্কুলে কিছু দিন পড়েছিলেন শুনেছি। কলেজের চৌকাঠও পার হলেন না—তিনি হলেন Essayist? তোমরা ও সব পড়—ও সব আমাদের পড়বার দরকার হবে না। আর নাটক—নাটক তো

গিরীশ ঘোষের আর অমৃত বোসের আমরা জানি। রবিঠাকুরেরও নাটক আছে নাকি? Public Theatreএ অভিনয় হয়?"

"না, Public Theatreএ অভিনয় হয় না। শান্তিনিকেতনে সবগুলোরই অভিনয় হয়।"

"তবেই বোঝা গেছে,—সে নাটক কি দরের। নিজের স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা বুঝি সেগুলো।"

"এসব নাটকের অভিনয় হলে সাধারণ লোকে রস উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই Public Theatreএ হয় না। সাহিত্য হিসাবে এগুলোর তুলনা নেই।"

"কেন, Shakespeareএর নাটক তো সাহিত্য হিসাবেও ভাল, Stage-এও বেশ জমত—আজো জমে। তবে কোথায় Shakespeare আর কোথায় রবিঠাকুর!"

"Shakespeareএর হ'ল Romantic নাটক। রবীন্দ্রনাথের হ'ল Symbolica নাটক। এ নাটক Public Stageএ জমে না। আপনি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যার কথা বললেন—তিনি স্কুলকলেজে পড়েন নি। তিনি বাড়ীতে বসে সারাজীবন ধরে অনেক পড়েছেন—তিনি ছিলেন খুব বড় পণ্ডিত।"

"তা হবে, অনেকবার ইউরোপ গিয়েছিলেন বটে, ইংবাজিটা বোধ হয় ভালোই শিখেছিলেন। ওঁর দাদা সত্যেন ঠাকুর প্রথম আই. সি. এস। তবে আমরা জানি কলেজে পড়ে পাশ ক'রে যে বিদ্যে হয় বাড়ীতে পড়ে তা হয় না। তা হলে সব ছেলেকে বাড়ীতে পড়ালেই তো হয়।"

"জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মত বাড়ী যদি হয়—আর শিক্ষার্থীর যদি অসামান্য জ্ঞানলিপ্সা থাকে তবে তা হয়।"

"সে কথা ঠিক। তুমি বলছিলে—রবিঠাকুর অনেক ধর্মের কথা লিখেছেন—তিনি তো জমিদার, বাবুলোক, সৌখীন লোক, হিন্দুয়ানিও মানতেন না—তিনি আবার ধর্মের কথা কি বলবেন?"

"তিনি মানুষের আসল ধর্ম কি তাই বুঝিয়েছেন—উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা ইত্যাদির নতুন ব্যাখ্যা ক'রে। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ভগবদ্‌ভক্ত লোক। নিজে যা উপলব্ধি করেছেন তাও বলেছেন।"

"ভক্তি-টক্তির কথা ছেড়ে দাও—তবে তিনি সংস্কৃত জানতেন খুব ভালো বোধ হয়। ঐ সংস্কৃত না জানার জন্য আমার ধর্ম করা হ'ল না। মাঝে মাঝে ধর্মের কথা মনে হয়। বুড়ো হ'লে সবার ধর্মে মতি হয় শুনতেও পাই।"

"আচ্ছা, আপনি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলো করলেও তো পারেন।—পূজা, জপ—"

"ওসব superstition আমি মানি না। গঙ্গা নাইলে, তীর্থে গেলে, পূজা করলে, কীর্তন করলে ধর্ম হয়—এসব আমি মানি না।"

"বাংলাতেও ধর্মগ্রন্থ আছে—তা পড়ুন না।"

"যেমন ?"

"যেমন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত।"

"ও সব তো সংস্কৃতে লেখা।"

"চরিতামৃতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক তোলা আছে বটে, কিন্তু আসলে বইখানা বাংলাতেই লেখা। শ্লোকগুলোরও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত আগাগোড়াই বাংলায় লেখা।"

"ও-সব পড়ে বুঝতে পারব না। ও-সব সেকেলে ভাষায় লেখা নিশ্চয়। আর বোরেগীদের ধর্ম তো খোল বাজানো মচ্ছব করা!"

"তবে এক কাজ করুন, বাংলার এই যুগের নিজস্ব ধর্মের কথা পড়ুন, পরমহংসদেবের উপদেশ পড়ুন—খুবই সোজা সরল, সর্ব শাস্ত্রের তত্ত্ব অতি সোজা কথায় লেখা।"

"আরে রামঃ, কি যে বলো তার ঠিকানা নেই। একজন নিরক্ষর পূজারী বামুন—শাস্ত্রের কীই বা জানে!—তার উপদেশ শুনে ধর্ম করতে হ'লেই হয়েছে। তার চেয়ে বরং বিবেকানন্দের নামটা করতে

পার,] লোকটা Graduate ছিল, কিন্তু তা হলেও এমন কি তিনি জ্ঞানী যে তাঁর কথা পড়ে ধর্ম শিখতে হবে ?"

আমি Maxmuller, Romain Rolland ইত্যাদি মনীষী ও সিস্টার নিবেদিতার কথা, বিবেকানন্দের সিকাগো লেক্‌চাব, ইউরোপ, এমেরিকায় বিবেকানন্দের প্রভাব ইত্যাদির কথা উল্লেখ করলাম।

তিনি বললেন—"দেখ, সকল দেশেই কতকগুলো ধর্মপাগল লোক আছে। তা ছাড়া ইউরোপ এমেরিকার লোকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ সাধু সন্ন্যাসীর দেশ, তারা এদেশের সাধু সন্ন্যাসীদের কথা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। ধর্মপাগলেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখে ও বলে, সেসব কথার উপর বেশী নির্ভর করো না।"

মিঃ ঘোষ উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত লোক, পিতৃবন্ধু। তাঁর সঙ্গে বেশী তর্ক বিতর্ক করা যায় না। তর্ক বিতর্ক ক'রেও লাভ নেই—এ বয়সে আর তাঁর মতিগতি বদলাবে না। এরূপ লোকের সময় কাটানো সত্যই কঠিন। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম—মিঃ ঘোষের মুখরতায়। তিনি বড়ই গম্ভীর ছিলেন, এত কথা তিনি বলবেন তা ভাবতে পারিনি। বুঝলাম—এটা জরার ও নিঃসঙ্গতার ধর্ম।

শেষে তিনি বললেন—"ধর্ম ধর্ম করছ—ধর্মই তো চিবকাল ক'বে এসেছি। ২৪ বৎসর বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলাম, ৫৭ বৎসর বয়সে চাকরি ছেড়েছি—অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত মনঃপ্রাণ সমর্পণ ক'রে। সাধুপথে আমি প্রতিপালকের নির্দেশ পালন ক'রে গিয়েছি—রাতেও আফিস আদালতের স্বপ্ন দেখেছি, অবসর কালে প্রভুরই ইষ্টচিন্তা করেছি,—কখনও মুনিবের প্রতি রাগবিদ্বেষ পোষণ করিনি। পুরস্কারও তাঁরা দিয়েছেন—সাহেবদের মত পদ পেয়েছি, পেনসন পাচ্ছি, টাইটেল পেয়েছি। ছেলেপুলে মানুষ হয়েছে, তাঁদের দয়ায় ক'রে কর্মে খাচ্ছে। গবর্ণরের সঙ্গে ডিনার খেয়েছি।—আজও

কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁদের স্মরণ করি। এইতো ধর্ম। এর বেশী ধর্ম আমার দ্বারা হবে না।”

আমি প্রণাম ক’রে বেরিয়ে আসবার সময় তিনি বললেন—“মাঝে মাঝে এসো প্রশান্ত। আহা! তাইতো তোমাকে কিছুই খেতে দেওয়া হ’ল না। আমার কাছে কেউ এলে এরা আপনা থেকে এক পেয়ালা চা-ও পাঠায় না। নিজেদের কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় এলে ঘটা ক’রে টেবিল সাজায়। কথায় কথায় আমারও ভুল হয়ে গেল—চাকরদের বলে তোমাকে কিছু আনিয়ে দিতে পারতাম। যাক, মনে কিছু কোরো না।”

আমি বললাম—“না, জ্যাঠামশায় মনে কিছুই করিনি, আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি যে এসেছি বাড়ীর লোকে হয়তো জানতেও পারেনি। ওঁদের হয়তো কোন দোষ নেই। আপনার চরণ দর্শন করলাম এই যথেষ্ট।”

পটোল

প্রত্যহ বাজারে যাই, কাজেই আনাজপত্র, মাছ ইত্যাদির দরের কথা আমাকে লোকমুখে বা রেডিওতে শুনতে হয় না। খবরের কাগজ পড়েও জানতে হয় না। পটোলের দর কি তা আমি জানি, তবু যদি দুই-এক আনা দাম কমেই থাকে, সেই ভরসায় দরটা একবার জিজ্ঞাসা করি। পশারী বলে—'বাবু আপনি তো কিনবেন না। মিছে কেন দর জিজ্ঞাসা করেন? আজকের দর দেড় টাকা সের।' দর শুনে চম্‌কে উঠি। মনে পড়ে বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে খুব বেশি হলেও পটোল দুই পয়সা সের দরে বিক্রী হ'ত। জানি না—পাটুলি, পাটলিপুত্র বা পটলডাঙ্গার বাজারে কি দর ছিল তখন। বিশ বছর আগেও জগুবাবুর বাজারে পটোল এক আনা সের দরে বিক্রী হ'ত। শুনি, যুদ্ধের ধাক্কায় ও চাপে টাকা পয়সার মূল্য চার গুণ কমে গেছে—তা হলে পটোলের দর চার আনা হ'বার কথা,—এ যে চব্বিশ গুণ!

পটোল না কিনেই বাজার থেকে ফিরি। গৃহিণী বলেন—'এক পোয়া আনলে তো পারতে, ছেলেমেয়েরা পটোল-পটোল করে।'

আমি বলি—'তা পারতাম। কিন্তু এই দামে তুচ্ছ একটা জিনিস যার খাদ্যমূল্য যৎসামান্য তা কেনা রীতিমত ক্রিমিন্যাল মনে করি। অন্ প্রোটেস্ট আমি কিনলাম না। ঐদামে পটোল কিনলে খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এই সমস্যার সমাধানে বা প্রতিবিধানে আমার মতো বৃদ্ধের আর তো কিছু করবার নেই।'

পটোলের কথায় মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের অটলের কথা। অটল লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখেনি—সে কোডরমার মাইকা মাইনে একটা চাকরি পেয়েছিল। মাস দুই পরে বিছানাপত্র নিয়ে ফিরে

এলো। বললাম—'ভাগ্যগুণে একটা চাকরি পেলি তা ছেড়ে চলে এলি, হতভাগা!' সে জবাব দিল—'খুড়োমশায়, যেখানে পটোল পাওয়া যায় না সেখানে কি চাকরি করা যায়?' আমি বললাম,—

পটোল নিজেই পটল তুলেছে।

'তুই পটোল বানান জানিস? বল দেখি।' সে হেসে বলল, 'তা আর পারব না কেন? প-ট-ল। ব'লেছিলাম,—'তুই পটোল

বানান পর্যন্ত জানিস না—তোর পটোল খাওয়ার সখ কেন? এখন গাঁয়ে বসে পটল তোল।' কথা হচ্ছে—পটোল নইলে চলবে না আমাদের এ ধারণা থাকলে আমাদের সবাইকে সত্য-সত্যই পটল তুলতে হবে। বুড়ো হয়েছি। আর কিছু না হোক সকল ক্ষতি-ক্ষতে সকল লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বেশ চিন্তা ও গবেষণা করে নিজেকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে শিখেছি। তাই এখন স্মরণ করি যুদ্ধের সময় আহার আহরণে কি কষ্টই না গিয়েছে! চাল, আটা, তেল, চিনি, আলু ইত্যাদির জন্য কি ছুটাছুটিই না করেছি! তেলের জন্য কতজনের পায়েই না তেল দিয়েছি! চিনির জন্য ধনী লোকদের চাকরদের সঙ্গে চিনির বলদদের দরজায় এক সারিতে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়েছি। তার তুলনায় তো এখন ঢের ভাল আছি।

লোকে বলে যুদ্ধ তো এখন নেই, এখন খাদ্যের মূল্য এত কেন? আমি বলি, যুদ্ধ তো এখনো থামেনি—যুদ্ধ রূপান্তর লাভ করেছে। যুদ্ধের ডামাডোল শেষ হলেও তার জের চলছে। তাই দুর্লভতা এখন দুর্মূল্যতার রূপ ধরেছে।

তবু তো আমরা যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখায় ঝলসাইনি—তার আঁচের সীমার মধ্যেই ছিলাম। যারা ঝলসে গিয়েছিল—তাদের দেশ থেকে যারা ফিরে আসে তারা বলে তাদের দশাও শোচনীয়। শুনে সান্ত্বনা পাই। তাদের দেশে পটোল জন্মালে দুই টাকা দাম হ'ত প্রতি সেরে।

তবু সেকেলে লোকদের মতো অদৃষ্টকে বা বিধাতাকে দায়ী করি না। একেলে লোকদের মতো দেশের কর্তাদেরও দায়ী করি না। দায়ী করি যুগ-বিপর্যয়কে। তাই অবস্থামতো ব্যবস্থা করে শেষের দিন কটা গুজরান করি। আর মনে মনে বলি, সারা জীবন. অনেক কিছুই তো খেয়েছি, শেষ জীবনে আর নাই খেলাম। হজমের শক্তিও তো আর নেই। খেতে পাচ্ছি না বলেই তো বেঁচে আছি।

তবে ছেলেমেয়েদের পাতের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর মনে মনে বলি—বড় দেরিতে তোরা ধরাধামে এসে

পড়েছিস। ধরাধামে এখন একটাকা সের পটোল! মুখে বলি—

যে সব জিনিস তোরা খাচ্ছিস সে সবই তো বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। ও-সবের মধ্যে ভিটামিন আছে প্রচুর। এই দেখ না, ভাতের ফেন ফেলা কত বড়ো নির্বোধের কাজ! ওতেই তো ভাতের সারাংশ রয়েছে! আটার চোকল ফেলাও ভাল নয়। মোটামুটি উপরি-উপরি চেলে ও ঝেড়ে নিলেই চলে। তাতে ভিটামিন বাদ যায় না। তেলে-ভাজা তরকারী বড়া-বড়ি লিভারের পক্ষে বিষবৎ। তেল যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। খাওয়ার চেয়ে নিজের মাথায় ও পরের পায়ে মাখানোয় তৈল আট গুণ হিতকর।

পটোল একটা বাজে আনাজ—তেমন সুস্বাদুও নয়। পটোলের চেয়ে পটোলের লতাপাতা সংক্ষেপে পলতাই বেশি উপকারী। সুশ্রুত-সংহিতা তার সাক্ষী। মোচা, কাঁচকলা, থোর, ডাঁটা, ডুমুর, ধুঁধুল, কাঁচা পেঁপে, মানকচু, ওল, ঢেঁড়স ইত্যাদিতে খাদ্যমূল্য ও খাদ্যপ্রাণ বেশি। এ-সবে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণ, সল্ট ইত্যাদি প্রচুর আছে। এ-সব খাদ্য খাওয়া বন্ধ করেই জাত দুর্বল হয়ে পড়ছে। ছেলেরা পরীক্ষায় ফেল হচ্ছে। মূলের মধ্যে কচুই সবচেয়ে উপকারী। হাসির কথা নয়, কচু পুড়িয়ে খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কচুর সমূল গোটা গাছটাই হিতকর খাদ্য। মানকচু শোথ রোগের ও ওল অর্শ রোগের মহৌষধ। নিমপাতাও অবহেলার বস্তু নয়। নিমপাতা খেলে লিভারের কাজ খুব ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ নিমপাতার শরবৎ খেতেন। কে জানে ঐ 'তিক্ত'ই তাঁর রচনায় 'মধুরে' পরিণত হ'ত কিনা। আর শাক! জানো শ্রীচৈতন্যদেব বিংশতি প্রকার শাক ভালবাসতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও চৈতন্য ভাগবতে শাকের গুণকীর্তন আছে। চিরদিন শাকান্ন কথাটাই চলছে—পটোলান্ন কথা কি কেউ শুনেছিস?

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আলু, কপি (বাঁধা-, ফুল-, ওল-) ডিঙ্গিলি কুমড়ো, ঢেঁড়স, পেঁপে, শালগম, বীট ইত্যাদির নামও শোনেননি।

তাঁদের এ সব না খেয়ে দিব্যি চলে গিয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, বর্গীর হাঙ্গামাতেও তাঁরা টিকে গিয়েছিলেন। এখন প্রত্যেক আনাজ দেশ-বিদেশ থেকে কলকাতায় আমদানির জন্য ও কোল্‌ড ষ্টোরে রাখার জন্য বারো মাস পাওয়া যায়—এ-সব পাওয়া স্বাভাবিক নয়, কাজেই বারো মাস এ-সবকে অপরিহার্য মনে করা উচিত নয়। পটোল যখন পাওয়ার কথা নয়, খাওয়ার কথা নয়, তখন পটোলের জন্য কাঙালপনা করা প্রকৃতিস্থ মানুষের লক্ষণ নয়।

দেশী চালকুমড়োকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। এর ভৈষজ্য গুণ অনস্বীকার্য, এতে কুষ্মাণ্ডখণ্ড নামে ঔষধ হয়। শাস্ত্রে আছে—অমৃতং পক্ক কুষ্মাণ্ডম্। আর বিলাতী কুমড়াও কম সুখাদ্য নয়। বিদেশাগত হলেও পুরীধামে মহাপ্রসাদের এই হলো প্রধান উপজীব্য। উড়িষ্যার বহু দেবালয়ের নাটমন্দিরে এই কুষ্মাণ্ড বা কখারু সারা বছর শিকায় ঝুলতে থাকে। বর্তমান যুগের কবিরা ছ আনার কুমড়ার ফালির সঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উপমা দিয়েছেন। এমন আয়ুষ্মান অতিবায় আনাজ আব নেই, নিশ্চয়ই আয়ু বৃদ্ধি করে।

প্রাচীন সাহিত্যে অলাবুরও গুণকীর্তন দেখা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ পেঁয়াজকে নিষিদ্ধ খাদ্য বলে ঘোষণা করে খুবই ঠকে গিয়েছিলেন—তোমরা যেন ঠকে যেও না। মনে রাখবে, আমাদের প্রগতির সূত্রপাত হয়েছে পেঁয়াজ ভক্ষণে।

এই সব আনাজ হলো আমাদের আয়ের আয়ত্ত। এখন মাছের কথা বলি। এই মাছ খাওয়ার জন্যই বাঙ্গালী সারা ভারতবর্ষে নিন্দনীয়। শাস্ত্রে আছে—মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদঃ—সর্বমাংস বলতে কি বুঝাচ্ছে—তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবু বাঙ্গালী একে অন্যতম প্রধান খাদ্য বলে গ্রহণ করেছে তার কারণ কি জান? মাছ যদি বাঙ্গালীর খাবার না হ'ত তাহলে বাঙ্গালী জাতকেই সাবাড় করতো এই জলো দেশের মাছেরা। মাছ অপবিত্র খাদ্য বলেই মাছ বিধবাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যদেবের দেশ—বৈষ্ণব-

প্রধান। এদেশে মৎস্য যে অশুচি আহার্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাত্ত্বিক লোকেরা মৎস্য ভোজন করেন না। মৎস্যকে সাধারণতঃ আমরা শবরূপেই পাই—জীবের মৃতদেহ কখনো সুরুচিমান লোকের খাদ্য হ'তে পারে না। তাছাড়া, মাছ খেতে গেলে গলায় কাঁটা বিঁধবার আশঙ্কা। ডিম খাওয়াতো ভ্রূণহত্যা। দেখ—মাছ-মাংসের অনুকল্প হল দাল। তোমরা যদি সিনেমা দেখা বন্ধ কর তা হলে বাটি ভরে দাল খেতে পারবে। দোকানের খাবার একেবারে খেয়ো না। ঐ সব খাবারে ঘৃত নেই। আছে উপ-ঘৃত কিংবা অপঘৃত। ঘৃত নামে পদার্থ এখন মৃত। তা স্বর্গে গিয়ে দেবভোগ্য অমৃত হয়েছে। বিশুদ্ধ ঘৃত খেতে হলে পশুদেবীকে পুষতে হয়। তিনিই স্বর্গ থেকে ঘৃত হরণ করে আনতে পারেন। কিন্তু তাঁকে রাখবে কোথায়? গৃহে তাঁকে ঠাঁই দিলে—আসবে গোবর—মাছি, বীজাণু, রোগ, ওষুধ, ডাক্তার—সর্বস্বান্তে সর্বশান্তি।

চা ছাড়তে পারবে না—ছেড়েও কাজ নেই, তার সঙ্গে দু-এক চামচা দুধ ও দু-এক খামচা চিনি পেটে যেতে পারে। তবে তার সঙ্গে বিস্কুট, কেক ইত্যাদি নয়—তার সঙ্গে চাই চীনাবাদাম ও মুড়ি।

ছেলেমেয়েদের এইরূপ উপদেশ দিয়ে গৃহিণীকে বললাম,—'আমরা যখন অন্য দেশ থেকে ভিক্ষায় পাওয়া চাউল খাচ্ছি—তখন ভিক্ষার চাউল কাঁড়া আকাঁড়া বিচার করবে না।'

কান ধরে টান দিলে মাথাও টলে, পটোল ধরে টান দিলে দেশের গোটা অন্নসমস্যাও অটল থাকে না। কাজেই সে সমস্যার কথা আপাততঃ থাক।

দেশ এখন বনারণ্যই হোক আর জনারণ্যই হোক—কোন অরণ্যেই রোদন সার্থক হয় না—ফসলও ফলে না। দেশে ক্ষুধা আছে খাদ্য নেই, ক্ষুধা নিবৃত্তির সাধ আছে সাধ্য নেই, সাধনাও নেই। ভাগে পাওয়া অনুর্বর ভাগ্যহীন দেশাংশে কৃষিজ উৎপাদন না বাড়লে এবং জৈব উৎপাদনকে দৈবের দান মনে করে নিশ্চিন্ত

থাকলে কোনদিন সমস্যার সমাধান হবে না। Procreation যদি অবলুপ্ত থাকে তবে Production তাকে কোন দিনই রেসে হারাতে পারবে না।

পটোলের দাম কমানোর চেষ্টার চেয়ে পটোল বর্জনের আন্দোলন প্রশস্ত ও নিরাপদ মনে করি। বলা-বাহুল্য, আমি ভাত বর্জনের কথা বলছি না, যদিও অনেকে ভাত ছেড়ে আটা ধরতে উপদেশ দিচ্ছেন। আমি অপরিহার্যের কথা বলছি না—পটোল বা পটোলের মত বস্তু অপরিহার্য নয়। পঞ্জিকাকারদের কাছে নিবেদন তাঁরা কতকগুলি মাস ও অধিকাংশ তিথিতে পটোল ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করুন। এখনো এদেশে অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দু পঞ্জিকাসেবী (দোহাই সম্পাদক, ছাপার ভুল না হয়)।

পটোলের বিরুদ্ধে দেশে একটা মনোভাব আগেই গড়ে উঠেছে।

সাহিত্যে চেরা পটোলের সঙ্গে সুনয়নার চোখের উপমা দেওয়া হ'ত,—ইদানীং বেতের ফলের সঙ্গে চোখের উপমা দেওয়া হয়। গত-যৌবনার কোটরগত চোখের উপমা দেওয়া হচ্ছে শুষ্ক কড়ির সঙ্গে, ভাজা পটোলের সঙ্গে কোন কবি উপমা দিচ্ছেন না। এখন আর ছেলেদের নাম পটলা এবং মেয়েদের আটপৌরে নাম পটলী চলে না।

একখানি শিশু-পাঠ্য পত্রিকায় পড়েছিলাম—

মুড়কি-মুড়ি পায় না খেতে বায়না ধরে গজা খাজার।
ডুমুর ভাজা পায় না খেতে খোট ধরে সে পটোল ভাজার।

পূজার সময় বাজারে গিয়ে দেখলাম কোন দোকানে পটোল নেই। শুধালাম তাদের—কই গো পটোল কই ?

একজন বলল—'পটোল যে অঞ্চলে জন্মে—সে অঞ্চলে এক কোমর জল।'

পটোল নিজেই পটল তুলেছে। আশ্বস্ত হ'লাম, যাক ধনীরাও, এমনকি কালোবাজারীরাও পটোল খেতে পাচ্ছে না।

—